রোজি দ্যারেঁ

শেখর সেনগুপ্ত

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
কালিপদ মজুমদার
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস
৩৩বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ
জহর দাস

তোমাকে

REGIS DEBRAY

by

Sekhar Sengupta

Price : Rs. 5·00

এই লেখকের

নির্যাতিত নিগ্রো

বিপ্লব দেশে দেশে

যন্ত্রণার তন্ত্রীতে নিজেকে বেঁধে যদি মন্ত্রমুগ্ধ গান গাইতে বসি, আপনি কি শুনবেন সেই নির্মম সুর ? ঘূর্ণায়মান গোলকের শ্বেত, কৃষ্ণ, পিঙ্গল ও অপিঙ্গলের ব্যথা ও তার মুক্তি যেখানে একই রেখায় এসে মিশেছে. সেখানে যদি আপনাকে আমি নিয়ে যেতে চাই, আপনি কি আপত্তি করবেন ? আপনি কি শুনবেন ইস্পাতের গুপ্তি মন্ত্র ? শুনবেন অগণন দধীচির উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত ?

ইতিহাস তো শুরু বহু যুগের ওপার হতে, যদিও তার প্রতিটি মাইল ষ্টোনই গুরুত্বপূর্ণ। অথবা, দার্শনিক চার্নিসেভস্কির ভাষায় বলতে পারি : ইতিহাস চলে মন্থর ভাবে ; কিন্তু তার এই চলা সম্ভব হয় এক একটা উচ্চ লম্ফনের মাধ্যমে।

এই উক্তিরই আরো বিশদ ব্যাখ্যায় বলতে পারি, এক একটি ঐতিহাসিক উচ্চ লম্ফন এক একটি বিপ্লবের সামিল। কল্পকথাও নয়, গল্পগাথাও নয়, শতাব্দীর অনাচারে-অবিচারে যত জঞ্জাল এসে জমেছিল, তাদেব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে ইতিহাসের এমন এক একটি রুদ্র রোষ।

ঘটনা ঘটে যায়। আমরা অনেক পরে তার মূল্যায়ন করতে বসি। কিন্তু নিক্তির ওজনে মাপতে গিয়ে অনেক সময়ই বিস্মিত বেদনায় ভাবি—কত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল, কত নদী শুকিয়ে গেল মরুপথে ! গভীর অন্তর্জ্বালায় সেই মুহূর্তে হয়তো মেহের আলীর মত বিকট চিৎকার করে জানিয়ে দেই : সব ঝুটা হ্যায় !....

কাজেই আজ যা ঘটছে, তার সঠিক তাৎপর্য সম্ভবতঃ আমরা

ধরতে পারছি না। তত্ত্বে-তত্ত্বে অহরহ ঠোকাঠুকিতে বিভ্রান্তি ফেনিয়ে উঠছে। আজ পর্যন্ত যেটা বিজ্ঞানসিদ্ধ দর্শন হিসাবে স্বীকৃত, তার এত রকমারি ব্যাখ্যা যে অনেকসময়ই মূল সূত্রটি আমরা খুঁজে পাই না। তবু ঘটনা যখন ঘটে, চিন্তার নতুন দিগন্ত যখন বিস্তারিত হয়, আমরা সচকিত হ'য়ে উঠি এবং তাৎক্ষণিক হলেও এর মূল্যায়ণে সচেষ্ট হই।....

হ্যাঁ, আসুন, অগণন দধীচির উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত খুঁজতে খুঁজতে আমরা পৃথিবীর আর এক গোলার্ধে গিয়ে উপস্থিত হই। উপস্থিত হই এক নতুন দেশে, বলিভিয়া যার নাম। মিরান্দা আর সাইমন বলিভারের দেশ। সূর্য কাঁদলে সোনার দেশ।

তামাম দেশটি অতি মাত্রায় তপ্ত। বিশ্বের উচ্চতম বিমানঘাঁটি এল্ আল্‌তো এয়ার পোর্ট থেকে শুরু করে লা পাজের মধ্য দিয়ে সেই উত্তেজনা আছড়ে পড়ছে। মুয়ুপম্পার নির্জন ভয়াবহ বনানীর প্রান্তদেশ পর্যন্ত। বলিভিয়ার প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোসের চোখ-মুখে যেন এসে হলকা লাগছে। একটা খাড়া পাহাড় থেকে যেন তিনি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছেন। বাতাসে পাচ্ছেন বারুদের ঘ্রাণ। বিপদ তাঁকে ঘিরে ধরেছে,—দুর্দ্ধর্ষ গেরিলারা এসে পোক্ত ঘাঁটি গেড়েছে বলিভিয়ার জঙ্গলে। চোরা গোপ্তা আক্রমণে তচনছ করে দিচ্ছে সরকারী বাহিনীর প্রতিটি আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টাকে। বারিয়েনতোসের বহু ঘোষিত 'অপারেশন সিন্‌তিয়া' প্রায় দিশেহারা।

প্রেসিডেণ্টের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, তাঁর মার্কিনী প্রভুদের কুটিল দৃষ্টিতে সন্দেহের ছায়া—এমন নিখুঁত গেরিলা যুদ্ধের পরিচালনা করছেন কে? সাহসিকতার সাথে ক্ষিপ্রতা, বুদ্ধির সাথে তিতিক্ষার এমন সংমিশ্রণ কার পক্ষে সম্ভব? এর উত্তরে একটি মাত্র নামই বার বার মনে আসে—আর্নেস্ট চে গুয়েভারা। গিয়াপ-কে বাদ দিলে গেরিলা-যুদ্ধের এত বড় স্থপতি আর কে আছেন?

চে যদি বলিভিয়ার জঙ্গলে এসে থাকেন, এর চেয়ে ভয়াবহ কিছু

ঘটতে পারে না প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের কাছে। আত্মরক্ষার প্রশ্নে আপো হিংস্র হ'য়ে উঠেছে পেন্টাগনও। ওয়াশিংটনের সাথে লা পাজের যোগাযোগ আরো নিবিড় হয়ে এসেছে। ঘন ঘন টেলি-প্রিন্টারে ফ্ল্যাশ মেসেজ আসছে: এনি নিউজ, এনি ডেভলেপ্‌মেন্ট ?

নিউজ আছে। নিত্য নতুন ডেভলেপ্‌মেন্টও ঘটছে। গোটা লাতিন অ্যামেরিকা জুড়ে বিপ্লবের সম্ভাবনা কাঁপছে থরথরিয়ে। সেই আবেগে সাড়া দিয়ে য়ুরোপের একাধিক আদর্শবাদী তরুণ ও বুদ্ধিজীবী ছুটে এসে সামিল হচ্ছেন মুক্তি যুদ্ধের। জোর গুজব চলছে:

'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' [Revolution in revolution ? [illegible]র লেখক রেজি দ্রেব্রে নাকি আত্মগোপন করে আছেন এই বলিভিয়ার জঙ্গলেই। চে'র পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় সম্মোহিত দৃষ্টিতে দেখছেন মুক্তি যুদ্ধের আশ্চর্য গতি!

গুজব যদি সত্যি হয়, তবে বলিভিয়াই হতে চলেছে দ্বিতীয় কিউবা। কিউবার মুক্তি ঘটিয়ে বলিভিয়াকে শোষণতন্ত্রের হাত থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছেন চে গুয়েভারা। রোমাঞ্চকর সমস্ত খবর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। দুনিয়ার নানা কেন্দ্রের বাঘা বাঘা সাংবাদিকরা এসে গিস গিস করছেন এল্‌ আল্‌তো এরোড্রোমে, বিলাসী লা পাজে, কারবারী কোচাবাম্বায়...থমথমে মুয়ুপম্পায়।

আন্তর্জাতিক গেরিলা ফ্রন্ট বলিভিয়া। যুদ্ধের কায়দা এখানে নিখুঁত। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয়, স্থানীয় জনগণের সাথে গেরিলাদের যোগাযোগ তেমন নিবিড় নয়। এই যোগসূত্র যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে যে কোন সংগ্রামই বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। আরো আশ্চর্যের কথা, বলিভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি গেরিলাদের সমর্থন করে না। তাদের ধারণা, সশস্ত্র সংগ্রামে মুক্তি আসবে না, বরং তাতে প্রতিক্রিয়াশীল শোষণবাদ আরো কায়েম হবে।

ভিয়েতনামের সাথে বলিভিয়ার তফাৎটা বোধহয় এখানেই। পিয়াপ সেখানে 'জনযুদ্ধের' নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; আর এখানে বলিভিয়ায়

চে সংগ্রাম করছেন প্রায় বিচ্ছিন্ন একটি আদর্শবাদী সুসংহত বেপরোয়া দল নিয়ে। গিয়াপের সাফল্য যেখানে অনিবার্য, চে সেখানে অনিশ্চিত—যে কোন মুহূর্তে হিসেবে সামান্য ভুলচুক হয়ে গেলে বিপর্যয় অনিবার্য

বিপর্যয়ের পূর্বাভাষ পাওয়া গেল কিছুদিনের মধ্যেই। অমোঘ নিয়তির ছায়া একটা আহত পশুর মত যেন থাবা বসালো মুয়ুপম্পার গহনে।....

একটার পর একটা কনভয় ছুটে চলেছে মুয়ুপম্পার দিকে। 'অপারেশন সিন্‌তিয়া'র একটি ছোট খাটো অংশ এক ঝাঁক সোনালী পাখীর মতো পথ চিরে বন ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগিয়ে যাচ্ছে সার সার। প্রতিটি সৈনিকের কঠিন চোয়াল, কারো কারো মুখে নির্বোধের হাসি। 'এ্যাকশান সিভিকা' আর 'অপারেশন সিন্‌তিয়া' করতে এসে এতকাল তারা যেন এক ছায়ার সাথেই লড়াই চালিয়ে এসেছে। গেরিলাদের মূল ঘাঁটি কোথায়, কোন পথ দিয়ে তারা যাতায়াত করে থাকে, কোন চোরাপথে তাদের হাতে এসে জমছে এত অস্ত্র, কে দিচ্ছেন তাদের নেতৃত্ব—হাজারো প্রশ্নের ধাঁধায় তারা যেন ক্রমশই নিজেদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। এর উপর রয়েছে বলিভিয়ান আর্মির দুর্নীতি। এরা প্রকাশ্যে জণগনের কাছ থেকে ঘুষ খায়, মাত্রাতিরিক্ত এ্যালকহলে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, প্রতিরক্ষার গ্যালন গ্যালন পেট্রোল বিদেশীদের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করে দেয়। বলিভিয়ার জঙ্গলে গেরিলাদের সংখ্যা যদি যথেষ্ট হতো, তবে এমন অপদার্থ সেনাবাহিনীকে মুছে ফেলা তাদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব হতো না। অবশ্য বলিভিয়ান আর্মির ভূমিকা এখানে গৌণ, আসল কলকাঠি নাড়ছে পেণ্টাগন—ভিয়েতনাম-কোরিয়া থেকে চিলি-বলিভিয়া যারা একই সূতোয় বেঁধে রেখেছে।

মুয়ুপম্পার গোটা এলাকাটা শুধু চড়াই আর উৎরাই। চড়াই যেখানে শেষ, সেখানেই শুরু গভীর অরণ্যানী, সূর্যের আলোও যেখানে প্রবেশ-পথ খুঁজে পায় না। লম্বা লম্বা ঘাঁসের মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা পথ, যে পথের হদিশ সাধারণে জানে না। মস্ত মস্ত গাছ-গাছালি যেন সিংহদরজা আর সুরক্ষিত গড়খাই, যেখানে অনায়াসে আত্মগোপন ক'রে আগুয়ান শত্রুকে ঘায়েল করা সম্ভব। অরণ্যের গভীরে আস্তর-খসা একটি প্রাচীর, প্রাচীন অশত্থের সংখ্যাতীত শিকড় শিরা-উপশিরার মতো বিস্তারিত। সেই প্রাচীরের ইঁট-বালির স্তূপের উপর একটি আধপোড়া চুরুট থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে। কে চুরুট ধরিয়েছিলেন ঐ অগম্য জায়গায়? চে গুয়েভারা না তাঁর সংগ্রামী বন্ধু রেজি ছব্রে? অথবা, তাঁরা দু'জনেই কি এই কিছুক্ষণ আগেও বসে ছিলেন প্রাচীরের গায়ে পিঠ দিয়ে?

লাগুনিলাসের ঝানু গোয়েন্দারা বিষ দৃষ্টি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই ঘুর ঘুর করছিলেন মুয়ুপম্পার বনের কাছাকাছি। ভেতরে ঢুকতে অবশ্য সাহস হয় নি—গেরিলারা মরু-ঝড়ের চেয়েও ক্ষিপ্র, হায়েনার চেয়েও নির্মম! শুধু বাতাসের ঘ্রাণ নিয়েছেন তাঁরা, বার বার মনে হয়েছে—এখানে আছে। এখানেই আত্মগোপন ক'রে আছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গেরিলা নায়ক আর্নেস্ট চে গুয়েভারা।

প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের কানেও গেল কথাটা। সুদর্শন লোকটির অ্যাকুইলিয়ান নাশা থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। ইয়াঙ্কি দোস্তদের সাথে শলা পরামর্শে বসে গেলেন। সি-আই-এ-ও ব্যাপার-টাকে উড়িয়ে দিতে পারছে না। বলিভিয়ায় যে চে ঢুকেছেন এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। আর মুয়ুপম্পার বনে যদি তার ঘাঁটি গড়ে ওঠে, আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না। অবশ্য গেরিলারা কখনো এক জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকে না। গতি ওদের সরিসৃপের মতো দ্রুত ও নিঃশব্দ। হয়তো এরই মধ্যে লাগুনিলাসের পল্টনদের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে মুয়ুপম্পা থেকেও সরে পড়েছে তারা।

হয়তো গোটা অভিযানটাই ব্যর্থ হবে—দু'এক টুকরো পোড়া চুরুটের খণ্ড ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না।

তবু আশায় বুক বেঁধে বারিয়েনতোষের বাছাই করা একটি দল সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে মুয়ুপম্পার দিকে। কনভয়গুলি ওঠে আর নামে। ফুটি-ফাটা নগ্ন প্রান্তরে ধূলোর ঝড়। আশে পাশের গ্রাম থেকে ছুটে আসে দু'একজন কৌতূহলী মানুষ। আবার শক্ত চোয়াল সৈনিকের রক্তচক্ষু দেখে তারা ইতি উতি গা ঢাকা দেয়।····ধূসর প্রান্তর পার হতেই দূরে দেখা গেল আসমান-ছোঁয়া গাছ গাছালির জটলা। কনভয়গুলির গতিও সাথে সাথে শ্লথ হয়ে আসে। বাতাসে যেন ভেসে আসছে হিস্ হিস্ শব্দ। প্রত্যেকে অতিমাত্রায় সচেতন, পাঁকানো আঙ্গুলগুলি চাপ খায় স্টেনগানের ওপর।

প্লেটুন কমাণ্ডার চোখে বায়নাকুলার লাগালেন। প্রথমে নজরে পড়লো, একটা ঘূর্ণি ঝড় পাকিয়ে পাকিয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। তারপর দেখলেন, গোটা মুয়ুপম্পার বনে বাতাসের আছাড়ি-পিছাড়ি, ঘন বাঁদাড়ে তাণ্ডব নর্তন।

তারপর—

তারপরই চিৎকার ক'রে উঠলেন প্লেটুন কমাণ্ডার: কিউরিয়াস !···· কী অবাক কাণ্ড! বনের ভেতর থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে আসছে তিনটি লোক।···· বেশ-ভূষায় বোঝা যায়, স্থানীয় গ্রাম্য লোক তারা নয়।···· সম্ভবত বিদেশী!

ব্যস! চকিতে পজিশন নিলো তারা। সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা কোমরের চেম্বারে হাত রেখে চক্রাকারে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে লোক তিনটিকে লক্ষ্য করে। কাছাকাছি আসতেই বোঝা গেল, এরা সত্যই বিদেশী। বয়সে কাঁচা, পেলব দৃষ্টি, গেরিলা সুলভ কাঠিন্য এদের নেই!

এরা কারা?

এখানে কি করছিল?···

পিস্তল দেখাতেই তাঁরা হাত তুললেন। একজন তো চিৎকার ক'রে উঠলেন : দোহাই আপনাদের, গুলি করবেন না। আমরা গেরিলা নই!

: সেটা থানায় গিয়ে প্রমাণ হবে। আপাততঃ গাড়িতে উঠে বসুন। গোয়েন্দা-প্রধান গম্ভীর ভাবে বললেন।

কিন্তু—

: কোন কথা নয়। গাড়িতে উঠুন।

তিনটি বিস্মিত বিব্রত প্রাণীকে নিয়ে কনভয়গুলি আবার ফিরে চললো শহরের দিকে। আবার বাতাসে হিস্ হিস্ শব্দ। যেন বিদ্রূপের হাসি হাসছে। এতক্ষণে ঘূর্ণি ঝড়টা পৌঁছে গেছে এখানেও। সৈনিকরা হাত দিয়ে নাক মুখ ঢাকে। হাতের আঙ্গুলগুলি নিস্তেজ। হয়তো ওদের মনে হলো—সবটাই প্রহসন! সেই ছায়ার সাথে লড়াই করবার আর এক দফা পণ্ডশ্রম মাত্র।

এবার আসুন, আমরা এই নবীন বয়সী বন্দী তিনজনের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবো। মুয়ুপম্পার সামরিক ঘাঁটিতে বহু দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের ভিড়। ক্যামেরার শাটারে ঘন ঘন আঙ্গুল নড়ছে—শব্দ উঠছে ক্লিক্ ক্লিক্। খুব সরগরম। চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ছে—তিনজন গেরিলা নাকি ধরা পড়েছে।

কিন্তু এরা আবার কি রকম গেরিলা?

সুবেশ সুদর্শন। অসামরিক পোশাকে যেন আপন আনন্দে বন দেখছিলেন। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। পালাবারও চেষ্টা করেন নি। হঠাৎ গোয়েন্দা-পুলিশের উদ্যত পিস্তল দেখে চমকে উঠেছিলেন : আমরা গেরিলা নই!

তবে কি আপনাদের পরিচয়?

পরিচয় দিতে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন এক নম্বর। স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতায় দামী ক্যামেরাটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলের উপর। মুচকি হাসি টেনে কোন ভনিতা না করে নিজেকে ব্যক্ত করলেন। আমি জর্জ রুথ—জাতিতে ইংরেজ, পেশায় প্রেস ফটোগ্রাফার।

রুথের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করা হলো। সন্দেহের কিছু নেই। যারা ভিড় জমিয়েছিল, হতাশ হলো। দ্বিতীয় নম্বর উঠে দাঁড়ালেন। গ্রীক পুরাণের নায়কের মতো টানা টানা চোখ মেলে জবানবন্দী দিলেন: আমার নাম রোবার্ত বুস্তস্। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন, আমি আর্জেন্টিনার লোক। আমি ভালো ছবি আঁকতে পারি। সেই সুবাদেই সাংবাদিকতার তকমা এঁটে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াই।

বুস্তসের কার্ড দেখে কিন্তু বিগ্রেডিয়ার সাহেব খুশী হলেন না। কপালের বলিরেখাগুলি আরো কুঁচকে আসে, দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন: আই ডাউট....আপনি সন্দেহমুক্ত নন। ভবিষ্যতে আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৈরী থাকুন।

রোবার্ত বুস্তস্ আরো কী যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু বলিভিয়ান ব্রিগেডিয়ার হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। যা বলবার, হেড-কোয়ার্টারে গিয়ে বলবেন। এখন আপনাকে ছাড়া চলে না।

কিন্তু তৃতীয়জন কি পরিচয় দেবেন? তিনিও কি এদের মতো নিছক সাংবাদিক? শত দৃষ্টির হাজারো প্রশ্ন বিছিয়ে আছে তাঁর মুখের উপর। এতক্ষণে নজরে এলো, অপর দু'জনের তুলনায় ওর চোখ মুখের ভাব অনেক দৃঢ়, প্রশস্ত কপালে কী যেন প্রতিজ্ঞা আঁকা, পুরু ঠোঁটে নিশ্চিত ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টির গভীরতায় প্রত্যয়েব কোন অভাব নেই।

খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চারদিকে সমবেত মানুষের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর প্রায় ঘোষণার মতো ধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠস্বর: আমি রেজি দ্যব্রে! পেশায় সাংবাদিক!

রেজি দ্যব্রে!

যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের এক শ্রেষ্ঠ

প্রতিনিধি, সাম্যবাদে বিশ্বাসী, গেরিলা-যুদ্ধের নতুন ভাষ্যকার, ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার একান্ত অনুগামী, তুনিয়া-জোড়া আলোড়ন আনা বই 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'-এর লেখক রেজি দ্যব্রে বলিভিয়ায় মুয়ু-পম্পা জঙ্গলে লাগুনিলাস বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন! এর চেয়ে আকর্ষক খবর আর কি হতে পারে? উত্তেজনায় ফেটে পড়ে জনতা। ওরই মধ্যে কারা যেন শ্লোগান দিয়ে উঠলো: লং লিভ দ্যব্রে! লং লিভ!....ডাউন উইথ দ্যা ইয়াঙ্কি! ডাউন! ডাউন!....

অবস্থা সামাল দিতে তিন বন্দীকে নিয়ে চটপট সামরিক লোকেরা মুয়ুপম্পার শিবির ছেড়ে ছুটতে থাকে কামিরির দিকে। ঘণ্টা দেড়েক একটানা ছুটবার পর কামিরির হেডকোয়ার্টারে এসে হাজির হলো তারা।....কয়েদখানার গরাদে হাত রাখবার আগেই প্রচণ্ড এক ঘুষি এসে লাগলো রেজি দ্যব্রের চোয়ালে। দ্যব্রে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কিন্তু তখনো তাঁর চোখে-মুখে কোন পরিবর্তনের ছাপ নেই। প্রশস্ত কপালে কী যেন প্রতিজ্ঞা আঁকা. পুরু ঠোঁটে নিশ্চিত ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টির গভীরতায় প্রত্যয়ের কোন অভাব নেই। আঘাত পেয়ে রেজি বুঝলেন, এই শুরু। প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোসের নারকীয় অত্যাচারের এটাই হলো প্রথম পর্ব! এমনি চলবে একটার পর একটা। আমৃত্যু।....

রুথকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

আটকে রাখা হলো রেজি দ্যব্রে এবং রোবর্ত বুস্তস্‌কে। প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোসের 'সুখী বলিভিয়ার' পক্ষে তাঁরা তু'জন নাকি অতি বিপজ্জনক লোক। শুধু তাই নয়, বারিয়েনতোস মনে করেন, 'স্বাধীন তুনিয়ার' একনম্বর শত্রু চে'র গতিবিধি এই তু'জন খুব ভালোই জানেন। অতএব, এদেরকে দিয়ে তা কবুল করাতে পারলে এক ঢিলে তু'পাখী মারা যাবে।

রেজি দ্যব্রে বন্দী।

পৈশাচিক উল্লাসে বারিয়েনতোস তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছেন। কোন প্রেসম্যান তাঁর সাথে দেখা করবার সুযোগ পাচ্ছেন না। ফ্রান্স তথা য়ুরোপের এক বলিষ্ঠ চিন্তানায়ককে হয়তো শেষ পর্যন্ত হত্যা করবেন বলিভিয়ান সরকার। ফিদেল কাস্ত্রো উষ্মা প্রকাশ করলেন, জাঁ পল সার্ত্রে দাবী জানালেন দ্যব্রের মুক্তির, দ্যগল বারিয়েনতোসের উপর চাপ দিচ্ছেন, রাসেল তাঁর ব্যক্তিগত দূত পাঠালেন দ্যব্রের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি সাজাবার জন্য।

কিন্তু সমস্ত দাবী, সমস্ত যুক্তি, সমস্ত অধিকার অস্বীকার ক'রে হিটলারী অহমিকায় বারিয়েনতোস বললেন: রেজি দ্যব্রে সম্পর্কে বিশ্বের অনেক দায়িত্বশীল মহলের এ রকম উৎকণ্ঠা দেখে আমি বিস্মিত। অথচ এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি কী বই লিখেছেন, কী থিয়োরী কপচিয়েছেন, তা দেখবার কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমি শুধু জানি, এই লোকটি আমাদের মাতৃভূমির সর্বনাশ করতে এসেছিলেন, বলিভিয়ার বাতাসকে বিশ্বাসঘাতকতা ও হিংস্রতার বিষবাষ্পে বিষাক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে এর জন্য ফলভোগ করতেই হবে। আইন তাঁকে ছেড়ে দেবে কেন?

দ্যব্রে দাবী করেছিলেন, তিনি নাকি সাংবাদিক। কিন্তু বলিভিয়ার গোয়েন্দা বিভাগ পাতি পাতি ক'রে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, তাঁর ঐ সাংবাদিকতার পরিচয়পত্র সম্পূর্ণ ভূয়ো। আর কিছু প্রামাণ্য কাগজপত্র দাখিল করলেই যে আমরা তাঁকে ছেড়ে দেবো, এমন আশা করাও ভুল, তাঁর বিরুদ্ধে অনেক জটিল ষড়যন্ত্রের প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আমরা জানতে পেরেছি, তিনি বলিভিয়ার জঙ্গলে জঙ্গলে গেরিলাদের মদৎ দিতেন। তামাম বলিভিয়ায় আগুন জ্বালাবার অভিসন্ধি ছিল তাঁর।

ভাবতে অবাক লাগে, এমন একজন নিচু স্তরের মানুষের মুক্তির জন্য মহামান্য ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য গল আমার কাছে দরবার করতে

আসছেন। পৃথিবীর নানা জায়গায় বেশ কিছু মনীষী বোধ হয় দ্যব্রে সম্পর্কে মোহাচ্ছন্ন। তাই তাঁরা জনে জনে এঁর মুক্তির জন্য আমার কাছে অনুরোধ পাঠাচ্ছেন। কিন্তু আমি নিরুপায়। যে লোক আমাদের সোনার দেশকে হত্যা, ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাকে আমরা ক্ষমা করবো কোন অধিকারে ?

রেজি দ্যব্রে সম্পর্কে আমি একটিমাত্র শব্দই উচ্চারণ করতে পারি—তিনি গুপ্তচর। ঘৃণ্য গুপ্তচর! স্থান তাঁর কয়েদখানায়। আদালতে হবে তাঁর বিচার। এ বিষয়ে কোন দ্বি-মতের অবকাশ নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যে বার্তাই প্রেরণ করে থাকুন, আন্তর্জাতিক প্রেসক্লাব যতই গুরুত্ব আরোপ করুক, আমরা কখনোই আমাদের জাতীয় শত্রুকে মুক্তি দিতে পারি না।

সার্ত্রে, রাসেল, দ্য গল····প্রত্যেকেই অতিমাত্রায় প্রাধান্য দিচ্ছেন দ্যব্রেকে। কিন্তু তাঁরা কি এখনো বিষয়টির সামগ্রিক গুরুত্ব অনুধাবন কররাব চেষ্টা করেছেন? যদি এমন একটি ঘটনা ফ্রান্সে ঘটতো, প্রেসিডেন্ট দ্য গল কি করতেন? যদি কোন বলিভিয়ান তরুণ ফ্রান্সে গিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র পাকিযে তুলতো, দ্য গল কি তাকে ক্ষমা করতেন?

ফিদেল কাস্ত্রোর জ্বালা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তাঁকে প্রশ্ন করছি, হুবার .মাতো-কে কেন তিনি জেলে পচিয়ে মারছেন? মাতো তো একজন গেরিলা, কিউবার মুক্তিতে তাঁর অবদান তো কম নয়! তবে কেন তিনি কাস্ত্রোর হাতে নির্যাতিত হচ্ছেন?

গুজবে কান দেবেন না। দ্যব্রের উপর কোনরকম শারীরিক নির্যাতন আমরা চালাচ্ছি না। তাঁকে হত্যা করবার তো কোন প্রশ্ন এই মুহূর্তে উঠছেই না। তিনি বিচারাধীন, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ তাঁকে দেওয়া হবে। রেডিও আর্জেন্টিনা. হঠাৎ বলে বসলো, দ্যব্রে নিহত হয়েছেন! এ সব কাণ্ডজ্ঞানহীন অভিসন্ধিমূলক প্রচারে কান দেবেন না।

আমরা এক অতি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। বলিভিয়ার জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে এক দুর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনী। দ্যব্রে সেই বাহিনীর অন্যতম সদস্য। আমরা জানি, এই বলিভিয়ার দুর্ভেদ্য জঙ্গলে চে গুয়েভারা আর রেজি দ্যব্রে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমাদের খতম করতে চেয়েছিলেন। দ্যব্রে ধরা পড়েছেন; কিন্তু আরো বিপজ্জনক গুয়েভারা এখনো আত্মগোপন ক'রে আছেন, অহরহ চোরাগোপ্তা আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলছেন আমাদের বাহিনীকে।

দক্ষিণ অ্যামেরিকার জনতার কাছে আমার অনুরোধ, এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলায় আপনারা আরো সচেতন, সংযত ও সক্রিয় হ'য়ে উঠুন। দ্যব্রেকে নিয়ে মাতামাতি করবার সময় এটা নয়। আজ যদি বলিভিয়া দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হয়, তবে চিলি, পেরু, ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা এর লেলিহান শিখা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

কমিউনিস্ট গেরিলাদের হাত থেকে আমি বলিভিয়াকে মুক্ত করবোই। এটা আমার এক পবিত্র শপথ। গুয়েভারা যতই কুশলী হোন না কেন, তাঁর পতন অনিবার্য। কারণ, গণজীবনের সাথে এই গেরিলাদের কোন আত্মিক সম্পর্ক নেই। অন্যধারে বলিভিয়ান সেনাবাহিনী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে সিক্ত, তামাম দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে গেরিলাদের মুছে ফেলতে তার বদ্ধপরিকর।

বলিভিয়ার এই দুর্দিনে শ্রেষ্ঠবন্ধু অ্যামেরিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞরা জানেন, কী ভাবে গেরিলাদের মোকাবেলা করতে হয়। আমাদের জোওয়ানরা ওদের কাছে তালিম নিচ্ছে। এ সাহায্যের কথা আমি কখনো ভুলবো না।

গভীর আত্মসন্তোষ নিয়ে বারিয়েনতোস তাঁর গালভরা বক্তব্য

রাখলেন। প্রেসম্যানদের সাথে করমর্দন করলেন। বুলেট-প্রুফ গাড়িতে চেপে ছুটে এলেন কামিরিতে। বারেকের জন্য তাকালেন কয়েদখানার দিকে, যেখানে পাশবিক অত্যাচার চলছে রেজি দ্যব্রের উপর। বারিয়েনতোসের টকটকে মুখে এক ঝলক রক্ত দ্রুত ওঠা-নামা করছে। চে—চে—চে। গেরিলা যুদ্ধের অজস্র ফুল্কি নিয়ে লোকটা কবে যেন ধূমকেতুর মতো উড়ে এসে পড়েছেন বলিভিয়ার জঙ্গলে। যেখানেই অত্যাচার, পীড়ন, অবিচার ও শোষণ, সেখানেই এমন উল্কাপাত। চে কি চান? To create two, three, many Vietnams?

পরিস্থিতি গেরিলাদের পক্ষে অনুকূল। বারিয়েনতোস হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। চার মিলিয়ন মানুষের অন্তিম আতনাদে বলিভিয়ার বাতাস কাঁপে। বিপ্লবের বারুদ সেখানে মজুত আছে। এখন শুধু অগ্নিসংযোগের অপেক্ষা। গেরিলাদের হাতে সেই আগুন। চে অনুভব করতে পারেন, তামাম দুনিয়ায় দেশে দেশে ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে। কিন্তু এই অন্তিম-লগ্নে বুর্জোয়ারা আরো মরীয়া, ভদ্রতার যাবতীয় মুখোশ খুলে রেখে নির্লজ্জ হিংস্রতায় ওরা এখন নিছক ছুরি শানাচ্ছে।

আর সব গেরিলা নেতার মতো আর্নেস্ট চে গুয়েভারা বিশ্বাস করেন, শোষণতান্ত্রিক সরকার কোন দেশে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা সর্বহারাদের হাতে তুলে দেবে না। আর নির্বাচন একটা গণতান্ত্রিক প্রহসন মাত্র—নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদ কোনদিন প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। তাই শোষণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে চূড়ান্ত মার দেবার একমাত্র উপায়—সশস্ত্র অভ্যুত্থান। বিজ্ঞানসিদ্ধ গেরিলা যুদ্ধ। একটি দেশের গোটা জাতিই একসাথে জনযুদ্ধের সামিল হতে পারে না। কিন্তু মুষ্টিমেয় গেরিলাদের ক্রমাগত দুঃসাহসী আক্রমণ ও সাফল্য তাদের উৎসাহিত করবে বিপ্লবী অভিযাত্রীদের সাথে যোগ দিতে। গেরিলাদের মানসিকতা আবেগে ভরপুর। দৃষ্টিভঙ্গী তাদের আন্তর্জাতিক সমভ্রাতৃত্ব বন্ধনে উদার।

আধুনিক গেরিলা রণনীতির অন্যতম আবিষ্কারক মাও সে-তুং। মাও সে-তুংয়ের কৌশল অবশ্য গুয়েভারার থেকে কিছুটা ভিন্ন। গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে নিজের ধারণা চেয়ারম্যান মাও খানকয়েক বইয়ে লিখে রেখেছেন। আধুনিক গেরিলা-সংগ্রামীর কাছে এর প্রতিটি রচনাই মূল্যবান। বইগুলির একটি তালিকা এখানে তুলে ধরা হলো :

(ক) চৈনিক বিপ্লবী যুদ্ধে রণনীতির সমস্যা [Problems of Strategy in China's Revolutionary War].

(খ) যুদ্ধ ও যুদ্ধ-নীতির সমস্যা [Problems of War and Strategy],

(গ) দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রসঙ্গে [On Protracted War],

(ঘ) বর্তমান অবস্থা এবং আমাদের যা করণীয় [The Present situation and Our Tasks],

(ঙ) শত্রুর শক্তিকে একে একে ঘায়েল করবার জন্য আরো উন্নত শক্তির সমাবেশ কর [Concentrate a Superior Force to Destroy the Enemy Force One by One],

(চ) জাপদের বিরুদ্ধে গেরিলা-রণনীতির সমস্যা [Problems of Strategy in Guerilla War Against Japan],

(ছ) একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ দাবাগ্নির সৃষ্টি করতে পারে [A Single Spark Can Start a Prairie Fire]।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন অ্যামেরিকায় যাঁরা মরণপণ সংগ্রামে নেমেছেন, তাঁদের অনেকেই মাও সে-তুং প্রদর্শিত পথে মুক্তি আসবে বলে বিশ্বাস করেন। সাম্রাজ্যবাদী জাপান এবং ইয়াঙ্কিদের প্রতিভূ জেনারেল চিয়াং কাইশেককে একদিন চৈনিক গেরিলারা যে ভাবে পর্যুদস্ত করেছিল, আধুনিক গেরিলারা সেই দৃষ্টান্তকে ভুলতে পারে না।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, জাপানের বিরুদ্ধে চীন একটি সাধারণ নিয়মিত যুদ্ধও সে সময় চালাচ্ছিল। গেরিলা তৎপরতা ছিল সেই যুদ্ধের সবচেয়ে কার্যকরি অনুপূরক মাত্র। সাথে সাথে আবার এ

কথাও বলা চলে, দেশ হিসাবে চীন বিরাট এবং এই বিরাট দেশে ব্যাপকভাবে গেরিলা যুদ্ধ চালানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। নানা দিক থেকে হাজারো সমস্যা প্রকট হয়ে উঠতো। একটার পর একটা বিপদ ঝাপটা মারতো। মনের উপর সৃষ্টি হতো দারুণ চাপ। এক এক সময় তো গেরিলারা নিজেরাই বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়তো, হতাশার অন্ধকারে আত্মসমর্পণের বিভীষিকা পেয়ে বসতো তাদের। সেই সব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন বলেই মাও সে-তুংয়ের গেরিলা নীতি আজ এক বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য লাভ করেছে।

সে সময় চীন তো সোভিয়েত রাশিয়ার মতো শক্তিশালী দেশ ছিল না! নিজের অস্ত্রবলেই সে যদি শত্রুপক্ষকে বেশ কিছুটা হটিয়ে দিতে পারতো, তবে গেরিলা যুদ্ধের বিশেষ কোন ভূমিকা আছে বলে আমরা স্বীকার করে নিতাম না। চীনে তখন অস্ত্রাভাব ও খাদ্যাভাব, সাম্রাজ্যবাদীদের নখর আক্রমণ তুঙ্গে, সুসংহত কোন সরকারী বাহিনী প্রায় নেই বললেই চলে; এ রকম পরিস্থিতিতে গেরিলাদের সাফল্য শুধু অভাবনীয় নয়, রীতিমত গবেষণার বস্তু।

তখনকার চীন আকারে মস্ত, কিন্তু শক্তিতে বড় দুর্বল। এই বিরাট ও দুর্বল দেশটি আক্রান্ত হয়েছে একটি ছোট্ট কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশ জাপানের দ্বারা। নিজের মস্ত আয়তনের জন্য এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদের জন্য চীনের সেই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য ছিল। যে কোন আক্রমণকারী দেশের মতোই জাপান ও চীনে তার অধিকৃত সমস্ত এলাকা নিজের কব্জায় রাখবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করতে পারে নি। জায়গায় জায়গায় অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। চৈনিক কমিউনিস্ট গেরিলারা সেই ফাঁকগুলির মধ্যে ঢুকে শত্রুদের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করলো। গেরিলাদের সাফল্যে উৎসাহিত হলো সাধারণ মানুষ, দলে দলে তারা এই বাহিনীতে নাম লেখাতে থাকে। যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, গেরিলারা ততই হয়রাণ করতে পারবে শত্রুকে। এ যেন এক চলমান যুদ্ধ [Mobile Warfare]। চকিতে স্থানত্যাগ

এবং অতর্কিতে আক্রমণ শানিয়ে শত্রুকে তারা দম ফেলবার সুযোগ দেবে না।

চেয়ারম্যান মাও সে-তুং পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। এমন ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ সংগ্রামের ইতিহাসে একেবারেই অভিনব। মাও সে-তুং নিজে ব্যাখ্যা করলেন, "....তথ্য ও ঘটনা আমাদের চোখের সামনে সাজানো। আমরা ১৯৩০ এবং ১৯৪০—দু'যুগের ঘটনা সমূহকেই যাচাই করে দেখেছি। আজ আমরা সংগঠিত করেছি একটি কমিউনিস্ট পার্টি এবং আমাদের রক্ষাকবচস্বরূপ রয়েছে লালফৌজ। এখানেই তো নিহিত রয়েছে বিষয়টির প্রাণকেন্দ্র। সুং বংশের উয়ান বিজয়, মিং রাজবংশের চিং জয়, উত্তর অ্যামেরিকা ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যজাল বিস্তার, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল এবং ইতালীর সাম্রাজ্যবাদী লোভাতুর দৃষ্টি—আমরা সবই অতীতের পাতায় খুঁজে পাচ্ছি। আমাদের বর্তমান শত্রুও সেই একই মানসিকতার অধিকারী। অথচ, আমাদের কাছে এমন স্বপ্নের কোন ব্যবহারিক মূল্যই নেই। কারণ, আজকের চীন সম্পূর্ণ ভিন্ন উপকরণ দিয়ে গঠিত। আর গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে সেই সব উপকরণগুলির একটি, যা ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। আমাদের শত্রু যদি এ ঘটনাকে উপেক্ষা করে, তাকে যদি দেখেও না দেখে তা হলে এর শাস্তি তাকে পেতেই হবে!...."*

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে চীনই প্রথম প্রমাণ করলো, জটিল অঙ্কের মতো গেরিলা রণনীতিও নির্ধারিত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। রীতিমত গবেষণার দরকার। প্রথাসিদ্ধ কামান-বন্দুকের লড়াই আর গেরিলা তৎপরতা এক জিনিস নয়। প্রতিরোধ ও আক্রমণ—উভয় ক্ষেত্রেই এতদিনের প্রতিষ্ঠিত সূত্রগুলির অদলবদল না করলে গেরিলা তৎপরতা চালানো কার্যতঃ অসম্ভব।

* 'জাপানের বিরুদ্ধে গেরিলা রণনীতির সমস্যা' [Problems of strategy in Guerilla war against Japan].

মাও বললেন, 'গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক নীতি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা এবং শত্রুকে খতম করা।'

যে আত্মগোপন ক'রে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং সাথে সাথে শিকারী বনচিতার মতো অতর্কিতে শত্রুকে ঘায়েল করতে পারে, তার পক্ষেই গেরিলা যোদ্ধা হওয়া সম্ভব। সামরিক যাবতীয় কাজকর্ম একটি মাত্র নীতিকে ঘিরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। সে-নীতি হলো: নিজের শক্তি বজায় রেখে শত্রুর শক্তি ধ্বংস করবার প্রাণপণ প্রয়াস চালানো।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, গেরিলা যোদ্ধারা কখনো যুদ্ধে বীরত্ব সহকারে আত্মদান করবেন না। প্রত্যেকটি যুদ্ধই তো সেই মূল্য আদায় করে নেবে। 'নিজেকে রক্ষা করার' সাথে এই আত্মদানের বস্তুতঃ কোন বিরোধ নেই। বরং আরো বিশদ ব্যাখ্যায় বলা যায়, আত্মদান ও আত্মরক্ষা হচ্ছে পরস্পরের বিপরীত ও পরিপূরক। সাধারণ ও স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য গেরিলাদের আত্মদান বৃহৎ অর্থে আত্মরক্ষা এবং বিজয়ের সামিল। এটাই হলো গেরিলাদের নিজেকে রক্ষা ও শত্রুকে ধ্বংস করার নীতি।

গেরিলা সংগ্রামের প্রতিটি তত্ত্বকে মাও সে-তুং তাঁর অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখেছেন। কোন ভুলচুক হয়ে থাকলে, পর মুহূর্তেই তার সংশোধন করে নিয়েছেন। কোন সমস্যা দেখা দিলে, তার ভিত্তিমূল ধরে পর্যালোচনা করেছেন।

জাপানের বিরুদ্ধে লড়বার সময় চীনা গেরিলাদের সামনে ছয়টি সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। মাও সেই সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবার জন্য ছয় দফা কার্যসূচী দাখিল করেন, যা আজও দেশে দেশে গেরিলাদের কাছে মন্ত্রগুপ্তির কাজ করছে—

(১) প্রতিরক্ষার প্রধান উপায় আক্রমণাত্মক সংগ্রাম। শত্রু শক্তিশালী হলে যুদ্ধকে ক্রমশই দীর্ঘস্থায়ী করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে অতি দ্রুত। একদল যখন চোরা-গোপ্তা আক্রমণ চালাবে, অপর

একদল তখন অন্ধকারে একেবারে প্রকাশ্য লড়াইয়ের মহড়া নেবে। এর জন্য দরকার, নেতৃত্বে গভীর মননশীলতা এবং সুচিন্তিত করিকল্পনা ;

(২) যুদ্ধের প্রতিটি শাখার সাথে নিয়মিত সমন্বয় বজায় রাখা ;

(৩) ভৌগলিক সুবিধা দেখে ঘাঁটি স্থাপন ;

(৪) যুদ্ধের গতি অনুসারে কখনো আত্মরক্ষা, কখনো বা প্রতি-আক্রমণ ;

(৫) সব সময় গেরিল্লারা অভ্যস্ত থাকবে এক চলমান যুদ্ধে ;

(৬) নেতার সাথে যোদ্ধার যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখা।

মাও সে-তুং বলেছেন, যে কোন যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে চাই 'উদ্যোগ-নেতৃত্ব'।* কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের অভিধানে এই 'উদ্যোগ-নেতৃত্ব' বলতে আমরা কি বুঝি? এর অর্থ হলো পরিস্থিতি বুঝে সংগ্রামরত বাহিনীর সামরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া চালাবার স্বাধীনতা। যে সেনাদল উদ্যোগ-নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে, তাদের এক ধরণের জড়ত্বে গ্রাস করে। পরাজয়ের ভয়াবহতা ড্যাশবোর্ডের মতো জ্বলছে-নিভছে ; অথচ, তারা তাদের নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। সমস্ত রকম ক্ষিপ্রতা ও উদ্ভাবনীশক্তি তাদের লোপ পায়। শুধু মাত্র নিশ্চিত ধ্বংসের দিন গুণতে থাকে তারা।

কঠিন হলেও গেরিলাদের এই উদ্যোগ-নেতৃত্ব লাভ করতে হবে। এটা তাদের পক্ষে অপরিহার্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গেরিলারা অধিকাংশ সময়ই অত্যন্ত কঠিন পরিবেশে তাদের তৎপরতা চালায়, অনেক সময়ই শত্রুবাহিনীর সংখ্যা ও রসদ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী থাকে, অনেক সময় নতুন ইউনিট গড়ে তোলায় যুদ্ধরত গেরিলাদের অভিজ্ঞতাও কম হতে পারে, সর্বোপরি, গেরিলাদের

* 'উদ্যোগ-নেতৃত্ব' শব্দটি ইংরেজী Initiative-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। উচ্চপদস্থের নির্দেশের অপেক্ষা না রেখে নীচু তলার ইউনিটগুলি যদি স্বাধীনভাবে সমূহ পরিস্থিতির সামাল দেয় অথবা যুদ্ধকে নিজেদের অনুকূলে টেনে আনে, তবে তাকে বলে 'উদ্যোগ-নেতৃত্ব।'

অন্যান্য ইউনিটগুলির সাথে সবসময় যোগাযোগ বজায় রাখা মোটেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই সমস্ত প্রতিকূলতাই জয় করা যায় উদ্যোগ-নেতৃত্বে।

শত্রুর ত্রুটি ও অসুবিধা লক্ষ্য ক'রে গেরিলারা তার সুযোগ নেবে, নিজেদের চিন্তাশক্তি ও উপাদান সমূহের [resourcefulness] পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাবে এবং তৎপরতার সাথে কাজে লাগাবে। গেরিলা ইউনিটগুলির নিজেদের মধ্যে যে দুর্বলতা রয়েছে, চলমান সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা ধীরে ধীরে তা কমিয়ে আনবে।

আবার আপাতঃভাবে গেরিলাদের যা দুর্বলতা, সেটাই হয়তো তাদের মস্ত সুবিধা। যেমন শত্রুর চেয়ে তারা সংখ্যায় কম এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্রও তাদের নেই, কিন্তু এরই ফলে তারা অবাধে ও ক্ষিপ্রতার সাথে চলাফেরা করতে পারে, শত্রুকে পিছন দিক থেকে রহস্যজনক-ভাবে আক্রমণ করতে পারে, আচমকা হাজির হতে পারে আবার তেমনি উধাও-ও হয়ে যেতে পারে—তাদের সম্পর্কে শত্রু কোনরকম ব্যবস্থা নেবার আগেই। এ ভাবেই গেরিলারা যুদ্ধে যে অনুকূল পরিস্থিতি নিজেরাই গড়ে তুলতে পারে, বৃহৎ নিয়মিত সেনাবাহিনী তা কোনদিনই পারে না।

উদ্যোগ নেতৃত্বের পর আসছে গেরিলাদের নমনশীলতার [flexibility] কথা। এটা হলো উদ্যোগ-নেতৃত্বেরই একটি মূর্ত [concrete] অভিব্যক্তি। মাও সে-তুং-এর নিজের কথায়, '....নিয়মিত যুদ্ধের তুলনায় গেরিলাযুদ্ধে নমনশীলতার প্রয়োগ অনেক বেশী কাম্য ও অপরিহার্য। এর অর্থ হলো, ছকে বাঁধা কোন নিয়মের পরিবর্তে প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মপন্থা অনুসরণ। তাই উদ্যোগ-নেতৃত্বের প্রধান সর্ত হলো নমনশীলতা।....আমাদের প্রধান যুদ্ধ-কৌশল হলো অনেকটা মাছ ধরা জাল নিক্ষেপকারী মৎসজীবীর মতো। আমরা আমাদের যোদ্ধাদের ঠিক ঐ জালের মতোই বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে দেই। জাল ছড়িয়ে দেবার আগে জেলে জেনে নেয়, জলের গভীরতা কতোখানি,

স্রোতের গতি কোনদিকে, বিশেষ কোন বাধা বিপত্তি আছে কিনা। ঠিক সেভাবেই নিজেদের ইউনিটগুলিকে ছড়িয়ে দেবার আগে গেরিলা-নেতৃত্ব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নেবে, পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কোন ধারণা এখনো অস্বচ্ছ কিনা এবং কোন ধারণার অভাবে গেরিলাদের ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা রয়েছে কিনা। জালটিকে দৃঢ়ভাবে চেপে গুটিয়ে আনবার জন্য মৎসশিকারী যেমন জালের দড়িটাকে শক্তহাতে ধরে রাখে, তেমনি গেরিলাদের সর্বাধিনায়ককেও তাঁর সমস্ত ইউনিটগুলির সাথে যোগাযোগ নিবিড় ক'রে রাখতে হবে।....

কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব ছাড়া গেরিলা যুদ্ধে জয়লাভ কঠিন ব্যাপার। ইউনিটগুলি যতই ছড়ানো থাকুক না কেন, নেতৃত্বের সম্পর্কে তারা কিন্তু এক ও অভিন্ন। কিন্তু তাই বলে গেরিলারা কখনো একটি বিশেষ জায়গায় নিজেদের 'একীভূত ক'রে রাখতে পারে না। এর পরিণতি মারাত্মক। শত্রু যদি একবার তাদের হদিশ পায়, তবে সমস্ত তৎপরতাই অর্থহীন হ'য়ে পড়বে।

কাজেই চরম কেন্দ্রীয়করণ ও চরম বিকেন্দ্রীকরণ—গেরিলা-নীতি উভয়েরই বিরোধী।....

এভাবেই মাও সে-তুং গেরিলা যুদ্ধের কতকগুলি বিশেষ সূত্র তুলে ধরেছিলেন। প্রয়োগ-নৈপুণ্যে তারা অসাধারণ।....গেরিলা যুদ্ধের প্রসার আজ অপরিসীম। শোষণবাদীদের সবচেয়ে বড় ভয় এই গেরিলারা। কেনিয়ার জঙ্গলে, ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে, কাম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে, সিনাই মরুভূমিতে, লাতিন অ্যামেরিকার দেশে দেশে, ভারতবর্ষের কয়েকটি ঘটনায় এবং সর্বোপরি সংগ্রামরত পূর্ব বাংলায় এই গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপক স্ফূরণ দেখা দিয়েছে। আবার গেরিলাদের খতম করবার জন্য ঠিক গেরিলা কায়দাতেই যুদ্ধ করতে শিখছে ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী বিপন্ন দেশগুলি। সেই কারণেই গিয়াপের বই মার্কিন সেনাদের পড়তে দেওয়া হয়। কী কায়দায় ভিয়েতনামী মুক্তিযোদ্ধারা

সংগ্রাম চালাচ্ছে, জানতে পারলে আরো সহজে ওদের মোকাবেলা করা যাবে।

সাম্যবাদে বিশ্বাসী; অকুতোভয় আবেগ-কাঁপা মনকে বার বার এই সব দুঃসাহসী গেরিলারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। জীবনের সমস্ত ধারণাগুলিই আস্তে আস্তে পাল্টাতে থাকে। অভিজ্ঞতার একটা নতুন চেক পোস্টে পৌঁছে এতদিনের ক্রীতদাস মন যেন প্রথম বন্ধনমুক্তির স্বাদ গ্রহণ করে। রুক্ষ পাহাড়, সবুজ গাছ গাছালি, ফুটি ফাটা প্রান্তর, ধূ ধূ মরুভূমি, রাশি রাশি জলজ তৃণ—প্রতিটি গেরিলা বুঝি প্রকৃতির সন্তান। শত্রুর মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, কিন্তু নিজেদের কোন আতঙ্ক-প্রতীতি তাদের নেই। চলা ফেরা অতি নিঃশব্দ, কথা বলে সংক্ষেপে, বাতাসে বিপদের ঘ্রাণ নেবার অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করছে। ধূর্ত শৃগালের মতো শিকার-সন্ধানী; আবার শত্রুর আক্রমণ ঘটবার মুহূর্তে চমকানো অন্ধকারে তারা মিশে যায়, আশ্রয় নেয় কোন মগডালে, কখনো বুকে হেঁটে পার হয় মাইলের পর মাইল—ঘাসের সুবাসে মুখ ঘষে ঘষে বোবা ভাষায় গজরায়।

সেই জীবন! সেই অনুভূতি !!

দমবন্ধ গহ্বরে আটকা পড়ে রেজি দ্যব্রে ভাবছেন সেই ফেলে আসা দিনগুলির কথা। তাঁর চকচকে দুই চোখে দুটি ছবি—একটি ফিদেল কাস্ত্রোর অপরটি চে'গুয়েভারার।

বিপ্লবের পর জনতার সামনে দাঁড়িয়ে ফিদেল যখন প্রথম উচ্চারণ করলেন 'Liberty with bread without terror', লক্ষ লক্ষ জনতা সহর্ষে অভিনন্দন জানালো—অমানিশার অবসানে হিমবাহের মতো গণমুক্তি নেমে এসেছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের নাকের ডগার সামনে কিউবা যেন এক শানিত খড়্গ। ইয়াঙ্কিদের কোটি কোটি ডলার ব্যয় আর সমস্ত অপচেষ্টা সত্বেও কিউবার গেরিলাদের দমন করা সম্ভব হয় নি। লাতিন অ্যামেরিকায় প্রথম সাম্যবাদের পতাকা উড়িয়েছেন ফিদেল

কাস্ত্রো। পাশে তাঁর চে গুয়েভারা। কিন্তু বিপ্লব যেখানে, প্রতিবিপ্লবের বিষ-ধোঁয়াও সেখানে ধূমায়িত। প্রতিবিপ্লব মদৎ পাচ্ছে অ্যামেরিকায়, ভেনেজুয়ালায়, অপপ্রচারের ঠাস বুনোটে তারা অক্লান্ত—কাস্ত্রো নাকি কিউবার মেহনতী জনতা ও কৃষকদের সর্বনাশ করছেন।

বিপ্লবের মধ্যেই বিপ্লব। একটি বিপ্লব সংঘটিত হবার পরেই প্রতি-বিপ্লবীদের খতম করবার জন্য আর একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান অনস্বীকার্য। কাস্ত্রো কী সেই সব প্রতিবিপ্লবীদের চিনতে পেরেছিলেন? ঘুষঘুষে জ্বরের মতো এরা জাতিকে শ্লো পয়জান করে। কাস্ত্রো কি কিউবার ধমণী থেকে সেই বদ রক্ত বের ক'রে দেবার জন্য নির্মম হাতে অস্ত্রপো-চার করেছিলেন? তাই কি বিদ্রোহী বিমান বহরের অন্যতম যোদ্ধা মেজর পেড্রো লুইস্ ডায়াজ লেঞ্জ, আজ কিউবা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন? তাই কি বিপ্লবের অন্যতম নেতা মেজর হুবার মাতো কিউবার কারাগারে পচে মরছেন?

উত্তর মেলেনা।

যবনিকার অন্তরালে কত যে রহস্য পাক খায়, বুঝবার উপায় নেই। তবু দ্যব্রের কাছে কাস্ত্রো আদর্শ পুরুষ। অত্যাচারী প্রেসিডেন্ট বাতিস্তার প্রেতাত্মাকে তিনি ক্যারিবিয়ান সাগরে নোনা জলে ডুবিয়ে মেরেছেন। কিউবার বুকে দাঁড়িয়ে আজ আর কারো সাহস নেই সেই স্পর্ধিত উক্তি উচ্চারণ করবার: Dirty communist—they are trying to take over my fine little democracy.

লাল চিহ্নিত মানুষের রক্তে স্নান করবেনা আর কোন জঙ্গীশাহী। অবশ্য ধনবাদী দেশগুলির আক্রমণ থেকে কিউবা সহজে নিস্তার পাবে না। প্রত্যক্ষ আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর চোরাপথে এ দেশে প্রতিবিপ্লবের আমদানী চলতে পারে। কাস্ত্রো সচেতন। সচেতন সে দেশের জনতাও।

ফিদেল কাস্ত্রো গেরিলা নেতা। কিন্তু তিনি কোন আদর্শে বিশ্বাসী? সি-আই-এ বিধান দিয়েছিল, ফিদেল কাস্ত্রো মোটেই কমিউনিস্ট নন।

সাম্যবাদের আদর্শ নিয়ে তিনি আসরে নামেন নি, যদিও আসর মাৎ করেছিলেন। সাম্যবাদের সামগানেই। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সদস্যও ছিলেন না কাস্ত্রো। মার্কিনীদের মতে, লোকটা পাকা অভিনেতা ও ধোঁকাবাজ। হিটলারের 'মাইন ক্যাম্প' আর লেনিনের 'হোয়াট ইজ টু বি ডান'—তুটো থেকেই উদ্ধৃতি তুলতে তিনি পারঙ্গম।

রংদার কেচ্ছা যতই ছড়াক না কেন, ফিদেলের গেরিলা-কৌশলকে অস্বীকার করতে পারে নি ইয়াঙ্কি হেডকোয়ার্টার। এই কৌশল কিছুটা অভিনবও বটে। মাও সে-তুং যে পথে গেরিলাদের চালনা করতেন, কাস্ত্রো ঠিক সেই পথের পথিক নন।

দক্ষ আইনজীবী ফিদেল একবার প্রকাশ্য আদালতে প্রবল প্রতাপ প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে দাঁড়ান। বিচিত্র অভিযোগ। তামাম কিউবা সেদিন সবিস্ময়ে তাকিয়েছেন এই যুবকের মুখের দিকে। ফিদেল বলছিলেন, 'স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তা রাষ্ট্র-দ্রোহের অপরাধে অপরাধী। তিনি বেয়নেটের মুখে ক্ষমতা বেদখল করেছেন এবং কিউবার পবিত্র গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন। আইনের অমুক নম্বর ধারা অনুযায়ী তাঁর অন্ততঃ ১০৮ বছরের হাজতবাস হওয়া উচিত।'

অদ্ভুত সাহসিকতা। একটা গোটা জাতির প্রচণ্ড অভিমান সেদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল তরুণ আইনজীবী ফিদেল কাস্ত্রোর গলায়। কিন্তু এর জবাবে তিনি পেয়েছিলেন বিদ্রূপের অট্টহাসি, অপমানের সূঁচীমুখ জ্বালায় ছটফটিয়ে উঠলেন, মাথা নীচু ক'রে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

ধাতব পাতের মতো আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে কাস্ত্রো সেদিন বুঝলেন, মুক্তি এভাবে আসবে না। বুর্জোয়া আইন জনতার জন্য নয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্র আর জঙ্গীশাহী একনায়কতন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক। মুক্তি আসবে শ্লোগানে নয়, গলাবাজিতে নয়, আসবে বারুদের উত্তাপে। হাঁ, শুকনো বারুদের উত্তাপেই গণমুক্তি সম্ভব। শক্তিশালী অত্যাচারী এই সরকারকে খতম করবার একমাত্র পথ গেরিলা যুদ্ধ।

মুষ্টিবদ্ধ ফিদেল পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন শহর পেরিয়ে, ক্যারিবিয়ান বিলাসকে দলিয়ে ক্রমশই গহন জঙ্গলের দিকে।

তারপর ২৬শে জুলাই।

ফিদেল কাস্ত্রোর নির্মম প্রতিজ্ঞা প্রথম বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। সেই প্রথম গেরিলা যুদ্ধের ভয়াবহতা আছড়ে পড়লো কিউবার বুকে। আছড়ে পড়লো দুর্ভেদ্য দুর্গ ম্যানকাডার উপর। রাত গভীরে চারধার থেকে পিল পিল ক'রে সতর্ক হায়েনার মতো গেরিলারা ঘিরে ফেললো সেই দুর্গকে। আচমকা শুরু ক'রে দিল গুলি বর্ষণ। রাইফেল আর স্টেনগানের অবিশ্রান্ত অগ্নিবর্ষণ। মর্টার আর গ্রেনেডের রাক্ষুসে বিস্তার।

চমকে উঠলো বাতিস্তার চমুরা। প্রথম ধাক্কা সামলে তারাও এর প্রত্যুত্তর দিকে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা সান্টিয়াগো শহর যেন এক বীভৎস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দিশেহারা জনতা ছোটাছুটি শুরু করে। দু'হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে মাথা ঠুকতে থাকে অনেক গোলা বিধ্বস্ত বাড়ির লোকেরা।

কাস্ত্রো সেদিন সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছিলেন: প্রতিটি বুলেট ব্যয় করবে হিসেব ক'রে এবং প্রতিটি বুলেটের শিকার হবে এক একজন দুশমন। কোন অসামরিক লোকের যেন বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয়। হুঁশিয়ার।

দুর্ভেদ্য প্রকাণ্ড ম্যানকাড দখল করতে সেদিন জমায়েত হয়েছিল মোটে দু'শ' জন গেরিলা। ক্যারিবিয়ানের অবাধ্য ঢেউয়ের মতোই সেদিন তারা বার বার আছড়ে আছড়ে পড়ছিল নিরেট প্রাচীরের বুকে। সান্টিয়গো থেকে খবর গেল কিউবার প্রতিটি প্রান্তে বাতিস্তার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সাধারণ লোকেরা এর পরিণতি ভেবে শিউরে উঠলো। হাজার হাজার সেনা শত শত সাঁজোয়া ছুটিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে ধেয়ে চললো সান্টিয়াগোর পথে।

অভিযান ব্যর্থ হলো।

মাত্র দু'শ' গেরিলার পক্ষে কখনোই তা সম্ভব ছিলনা। তা ছাড়া তখনো গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তেমন হয় নি কাস্ত্রোর। নেতৃত্বে গলদ ছিল। কিন্তু সাহস ও আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না। সরকারী সৈন্যরা ঘিরে ফেললো তাদের। ক্রমশই কোণঠাসা হয়ে ম্যানকাডার গথিক রীতির দেয়ালে পিঠ রেখে তারা মরণপন লড়াই ক'রে গেল। জঙ্গী জমানা গোটা শহরটাকে হিংস্র ক'রে তুললো। গির্জার গায়ে পর্যন্ত এসে লাগলো রক্তের দাগ। ফ্ল্যাশ লাইট ফেলে নির্বিচারে গুলি চালালো তারা।

ভোর হতে দেখা গেল, রক্তে ধুয়ে গেছে ম্যানকাডা দুর্গের সামনের প্রশস্ত প্রান্তর। একশ' ত্রিশটি তাজা প্রাণ বলি দেওয়া হয়েছে প্রথম বিপ্লবের বার্তা বয়ে আনতে। আশ্চর্য তৎপরতায় গা ঢাকা দিতে পেরেছেন ফিদেল কাস্ত্রো। তাঁর মনের একটা রোমাঞ্চকর স্বপ্ন বাস্তবের নিষ্ঠুর প্রত্যাঘাতে ভেঙ্গে চুড়মার হ'য়ে গেছে। নেতৃত্বে গলদ আছে। সংগ্রামের ধারা পাল্টাতে হবে। গেরিলা যুদ্ধে হিসেবে কিছু ভুল থাকাটা অতি মারাত্মক—বড় বেশী মূল্য দিতে হয়।

কাস্ত্রোর মনে হয়েছিল, তিনি যেন এক শব শকটের চালক। একশ' ত্রিশটি শব নিঃশব্দে বয়ে নিয়ে চলেছেন। আবেগে নিস্ফল আত্মদানের কোন অর্থ হয় না। গতকালের রক্তাক্ত কুঞ্চিত স্মৃতিকে চোখের সামনে মেলে ধরে কাস্ত্রো তাঁর ভবিষ্যৎকে দেখবার চেষ্টা করলেন।

কাস্ত্রো যখন অনেক দূরে, প্রখর নগ্ন সূর্যের নীচে সান্টিয়াগো তখন প্রেতনৃত্য শুরু ক'রে দিয়েছে। মুষ্টিমেয় গেরিলাদের আক্রমণ প্রতিহত করেই খুশী নয় বাতিস্তার বাহিনী। খুনের নেশায় তারা তখন মেতে উঠেছে। যুবক আর বুদ্ধিজীবীদের রক্তে-স্নান করলেন প্রেসিডেন্ট বাতিস্তা।....

কাস্ত্রো ও তাঁর দু'শ' জন গেরিলা ম্যানকাড জয় করতে পারে নি। কিন্তু কিউবার ইতিহাসে এ ঘটনার গুরুত্ব অসাধারণ। জনগণ সেই

প্রথম ভাবতে পারলো, বাতিস্তার বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরবার মতো মানুষ তাদের দেশে আছেন। সেই মানুষদের সংখ্যা ও সংহতি যত বেড়ে যাবে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে কিউবার মুক্তি তত ত্বরান্বিত হবে।

বাতিস্তার চোখে ঘুম নেই। আলমগীরের মতো নিজের ছায়া নিজেই দেখে আঁতকে উঠছেন। সি-আই-এ খবর দিয়েছে, কিউবার চারপাশে গেরিলারা ধীরে ধীরে নিজেদের সংহত করে নিচ্ছে। ফিদেল কাস্ত্রোর পরবর্তী আক্রমণ আরো প্রচণ্ড ও ভয়াবহ হয়ে উঠবে, যার মোকাবেলা করবার মতো সামর্থ্য বাতিস্তার নাও থাকতে পারে!

বাতিস্তা ঘোষণা করলেন: কাস্ত্রোর মৃতদেহ কিউবান সরকারের হাতে যে তুলে দিতে পারবে, সরকার তাকে আশাতীত পুরস্কার দেবেন।

ফিদেল ছুরির ফলার মতো হাসলেন। আর তিনি পরাজিত হবেন না। এখন শুধু ম্যানকাড কেন, গোটা কিউবা অধিকার করে নেবার মতো প্রস্তুতি চলছে তাঁর। কিউবার শহর ও গ্রাম থেকে অসংখ্য যুবক জঙ্গল ভেঙ্গে উঠে আসছে পাহাড়ে ফিদেলের কাছে গেরিলা-সংগ্রামে দীক্ষা নিতে। ফিদেলের মুখ-চোখ খুব কঠিন—সেই একশ' ত্রিশ জন মৃত সহকর্মীর আত্মদান তাঁকে অহরহ যেন এক অগ্নিকুণ্ডের ধারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে তাঁর আরো এক জ্বালা, প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তার নিত্য নতুন ফতোয়ায় কিউবার সাধারণ মানুষ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে। বাতিস্তা বলেছেন, যতদিন না জীবিত বা মৃত অবস্থায় কাস্ত্রোকে পাওয়া যায়, ততদিন এমন অত্যাচার চলবে!

কি করবেন কাস্ত্রো?

ধরা দেবেন?

যদি ধরা দেন, কি ঘটতে পারে? প্রাণদণ্ড?

মৃত্যুর বিনিময়ে ফিদেল কাস্ত্রো এমন অত্যাচারের নগ্নলীলা বন্ধ করতে চাইলেন। কাস্ত্রোরই এক সহপাঠী পেড্রো সে-সময় বাতিস্তার বাহিনীর এক লেফ্‌টানেণ্ট। কাস্ত্রোর সাথে গোপনে দেখা করলেন

তিনি। বললেন, ধরা পড়লেও কখনো নিজের নাম প্রকাশ করো না। ওরা তোমায় গুলি ক'রে মারবে।

আশ্চর্য মানুষ ফিদেল কাস্ত্রো। সিয়েবার গহন জঙ্গলে গেরিলাদের প্রস্তুত থাকতে বলে নিজে নেমে এলেন সমতলে। সাথে তাঁর অল্প কয়েকজন সহকর্মী এবং সহোদর রাউল কাস্ত্রো।

সান্টিয়াগোর সামরিক শিবিরে সরাসরি ঢুকে পড়ে ফিদেল হাত তুলে বললেন: সাধারণের উপর অত্যাচার বন্ধ করুন। আমি ফিদেল কাস্ত্রো—স্বেচ্ছায় ধরা দিতে এসেছি। আর এই আমার ভাই, সুখ-দুঃখের সবচেয়ে বিশ্বস্ত পার্শ্বচর রাউল কাস্ত্রো!

বিস্ময়ে ক্যারিবিয়ান বুঝি নিথর হ'য়ে গিয়েছিল সেই ক্ষণে। গেরিলা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বিস্মিত আড়ষ্ট সন্দিগ্ধ কিউবান জেনারেলের মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে এলো: ইজ ইট! ইজ ইট!

কাস্ত্রো হাসলেন। সেই শাণিত হাসি। হ্যাঁ, আমিই ফিদেল কাস্ত্রো। আপনাদের প্রভু মহামান্য বাতিস্তাকে খবর পাঠান। আপনাদেরও পদোন্নতি অনিবার্য!

আগুনের মতো জ্বলছে সেই সব স্মৃতি। প্রেসিডেন্ট বারিয়েন-তোসের কয়েদখানার দেয়ালেও যেন সেই ইতিহাসের লেখাগুলি পড়তে পারছেন রেজি দ্ব্রে মেহনতী মানুষের চামরা দিয়ে মোড়া লাতিন অ্যামেরিকার প্রতিটি মসনদ। তাই বুঝি রক্তের ঋণ শোধ করতে আবির্ভূত হন ফিদেল কাস্ত্রো, চে গুয়েভারার মতো মানুষ। জনতার আকুল বিলাপে স্থির থাকতে না পেরে তাঁরা কখনো রুদ্র রোষে ফেটে পড়েন, কখনো বা দরদী পেলবতায় আপ্লুত হয়ে ওঠেন। দ্ব্রের রোমান্টিক মন সেই চেতনার স্পর্শে আদর্শের পায়ে নিবেদিত। বারিয়েনতোসের শত অত্যাচারেও তা কোন দিন ভেঙ্গে পড়বে না।

মনে পড়ে, ফিদেলের বিচার-প্রহসন চলেছিল কোন আদালতে নয়; অসুস্থ কাস্ত্রোকে টেনে আনা হয়েছিল নার্সদের এক কোয়ার্টারে। ছিয়াত্তর দিন ধরে অমানুষিক অত্যাচারে কাস্ত্রোর শরীর তখন ভেঙ্গে পড়েছে, নার্ভের উপর সৃষ্টি হয়েছে অসম্ভব চাপ। তবু দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ধরে কাস্ত্রো বিচারকদের সামনে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। *

কাস্ত্রোর কণ্ঠস্বর অকম্পিত। কখনো কখনো সেই কণ্ঠস্বর বিদ্রূপে ঝাঁজালো, কখনো বা তাতে অশনি-সংকেত।

'....বুঝুন, মাননীয় বিচারকগণ, কী বিচিত্র শাসন-ব্যবস্থায় আমাদের বাস করতে হয়। আমি অভিযুক্ত অথচ, আমার বিচার কোন আদালত প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। মহামান্য প্রেসিডেণ্টের তাতে দারুন ভয়। তাই বিচার-আসর বসেছে এক রুদ্ধদ্বার নার্সেস্ কোয়ার্টারে! এর চেয়ে বিচিত্র, এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে!

বাতিস্তা মহারাজের এত ভয় কিসের? আমি তো স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছি। আমি তো নিরস্ত্র, আমি তো চূড়ান্ত অত্যাচারে লাঞ্ছিত। তবু আমার কণ্ঠরোধ করা হলো। আমার এই বক্তব্যের বিন্দু বিসর্গও যাতে বাইরে পাচার হয়ে না যায়, তার জন্য কতনা সতর্কতা! আমি যেন ঐ দেয়ালগুলিকেই আমার যা বলবার বলে যাচ্ছি।

মাননীয় বিচারপতি, আপনি কি এই পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন? নিশ্চয় নয়। কারণ, আপনারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছেন, এতে সামগ্রিকভাবে বিচারসভাকেই অপমান করা হচ্ছে।

আর জনতা? তারা দেখছে জঙ্গী দাপটের মুখে এ দেশের আইন-বিভাগ কেমন রক্তশূণ্য হয়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়েছে!....

আমি এখানে কোন প্রতিহিংসার কথা বলবার জন্য আসি নি। আমার প্রাণাধিক সঙ্গীদের যারা হত্যা করেছে, এই মুহূর্তে তাদের

* ফিদেল কাস্ত্রোর সেই ঐতিহাসিক ভাষণই পরে 'ইতিহাস আমায় মুক্তি দেবে' নামে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। আধুনিক কিউবায় এই বইটি সর্বাধিক জনপ্রিয়।

বিরুদ্ধে আমি হিংস্র হ'য়ে উঠছিনা। তারা জেনে রাখুন, আমার সে-সব বন্ধুরা মৃত 'নন। কোন মদগর্বী সরকারের সাধ্য নেই, তাঁদের মুছে ফেলতে পারে। লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনতার অন্তরে তাঁরা বেঁচে আছেন, থাকবেনও চিরদিন। স্বাধিকার অর্জনে তাঁদের সেই সংগ্রাম বহতা নদীর মতো অপ্রতিরোধ্য। বিপ্লবীরা পূর্বসূরীদের জন্য শুধুমাত্র অশ্রুপাতেই ক্ষান্ত থাকে না; তাঁদের আদর্শকে বাস্তবায়িত করবার জন্য সংগ্রামের মধ্যদিয়ে শহীদদের স্মৃতি-তর্পণ করে থাকে।....

বাতিস্তাকে আমি কিউবার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা বলে মেনে নিতে পারি না। জনতার রায়ে তিনি ক্ষমতা পান নি। পশুশক্তির দাপটে তিনি গদি অধিকার করেছেন। তাঁর কি সাধ্য আছে গণরায়ের মুখোমুখি হবার? কোন অধিকারে তিনি এ দেশের আইন ও সংবিধান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন?....

মাননীয় বিচারপতি, ভাববেন না যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে কোন সুবিচার প্রত্যাশা করছি। আপনাদের করুণ অবস্থা আমি উপলব্ধি করতে পারি। আইন যেখানে গুলির মুখে আবদ্ধ, সেখানে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে যাওয়াটা মস্ত বেকুবের কাজ। আমাকে নির্দ্বিধায় আপনারা যে কোন শাস্তি দিতে পারেন। আমার বুক লক্ষ্য ক'রে এই মুহূর্তে গুলিও চালাতে পারেন। বাতিস্তার আইনে আমি মুক্তি চাই না। আমাকে মুক্ত করবে ইতিহাস।(*)

পনেরো বছরের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো এসে ঢুকলেন বাতিস্তার কারাগারে। কিন্তু ততক্ষণে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গেছেন। গণ-বিক্ষোভের তরঙ্গ আছড়ে আছড়ে পড়ে সর্বত্র। ফিদেলের মুক্তির দাবীতে যুবকরা, বুদ্ধিজীবীরা, মেহনতী শ্রমিক ও কৃষকরা বাতিস্তাকে ধিক্কার জানায়। আন্দোলন দিনের পর দিন তীব্রতর হয়ে ওঠে।

বাতিস্তা বুঝলেন, ফিদেলকে আটকে রাখতেই তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে চলেছে। তাঁকে মুক্ত করবার আশা নিয়ে প্রতিদিন শত

শত যুবক আত্মগোপন করছে, নাম লেখাচ্ছে গেরিলা বাহিনীতে। কাজেই কাস্ত্রোকে কয়েদ করে রাখবার অর্থ গেরিলাদের সামর্থ্যকে আরো বাড়িয়ে দেওয়া।

চতুর বাতিস্তা তাই হঠাৎ একদিন নাটকীয় ভাবে ঘোষণা করলেন: পবিত্র গণতন্ত্রের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে আমি সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে চাই।

সত্যি, মুক্তি পেলেন ফিদেল কাস্ত্রো।

ইতিহাস তাঁকে মুক্ত করলো; বাতিস্তার নাটকীয় ঘোষণা উপলক্ষ্য মাত্র।

আবার শুরু হলো বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি। বাতিস্তাও সতর্ক। ঝানু গোয়েন্দারা ছায়ার মতো অনুসরণ করছে ফিদেল কাস্ত্রোকে। এ ভাবে কাজ করা যায় না। ফিদেল তাই বিদেশে পাড়ি জমালেন। বিদেশে প্রবাসী কিউবানদের নিয়ে গেরিলা সংগঠন প্রসারিত করা তাঁর উদ্দেশ্য।

মোটা টাকার তোড়া নিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন টেক্সাসে প্রবাসী গদিচ্যুত প্রাক্তন কিউবান প্রেসিডেণ্ট প্রিয়ো। এই টাকা কিউবার মুক্তি সংগ্রামে খুব কাজে লেগেছিল। চতুর ফিদেল অবশ্য প্রিয়োর মানসিকতা বুঝতে ভুল করেন নি। এ ধরণের মানুষ কোনদিন বিপ্লবের পথে অভিযাত্রী হতে পারেন না। শুধু ক্ষমতা লাভের আশায় ফিদেলকে অর্থ সাহায্য করলেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে এলেন কাস্ত্রো। এ দেশের বুকে পা রেখেই তিনি বুঝলেন, তাঁর ঈপ্সিত স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে মেক্সিকোর বিপ্লবীদের সাহায্য সবচেয়ে মূল্যবান। মেক্সিকোর প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট লেজারো কার্ডনাস বললেন: আপনাদের সংগ্রামের পিছনে আমার অকুণ্ঠ সমর্থন রইলো।

শ্রমিক নেতা টোলেডানো বললেন : মেক্সিকোর মেহনতী জনতা আপনাকে সমর্থন করে।

সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হলো, এই মেক্সিকোতেই ফিদেল কাস্ত্রোর সাথে আর্নেস্ট চে গুয়েভারার সাক্ষাৎ হয়েছিল। দু'জন দু'জনকে দেখেই চমকে উঠেছিলেন। একজন যেন অপরের দর্পণে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন। আবেগে-পুলকে গুয়েভারার একখানা হাত চেপে ধরলেন কাস্ত্রো : কিউবার লক্ষ লক্ষ জনতার মুক্তি-সংগ্রামে আপনাকে আমাদের বড় প্রয়োজন।

গুয়েভারা হাসলেন। বিস্ময়ে কাস্ত্রো দেখলেন, এযে সেই শানিত হাসি, যাতে তিনি স্বয়ং অভ্যস্ত।....

দুই

একটা দীর্ঘ বর্শার মতো ঝকমকে গাড়িটা সোজা ছুটে চলেছে লা পাজের দিকে। সামনে-পিছনে পাইলট কার। দিগন্তকে দু'ফালি ক'রে যতদ্রুত সম্ভব এগিয়ে যাবার প্রয়াস। মসৃণ পীচের রাস্তায় চাকাগুলি এত দ্রুত ঘুরপাক খাচ্ছিলো যে মনে হচ্ছিলো ওরা যে কোন মুহূর্তে খুলে যেতে পারে। মূল গাড়িটা যেন সফররত শঙ্খচিল— বেপরোয়া পক্ষতাড়ণে অক্লান্ত। লা পাজে তীর্থের কাকের অভাব নেই। তাদের কাছে মনের ঝাল আর আবেগ উজার না ক'রে দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

সমুদ্র ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে এ জায়গাটা। এখানে পাহাড় আছে, বন আছে। সমুদ্র নেই। কিন্তু ধাববান গাড়ির মাননীয় আরোহীর থেকে থেকে মনে হচ্ছে, তিনি যেন সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন। ক্যারিবিয়ান হুঙ্কার? ঐ উঁচু টিলাটার উপর দাঁড়ালে কি সমুদ্রকে দেখা যাবে? অথবা, তিনি হয়তো এক বালিয়াড়ির উপর দিয়ে দৌড়াবার চেষ্টা করছেন। পায়ের নীচে চোরাবালির চোরাটান। শঙ্খচিল যতই পাখা ঝাপ্টায়, চোরাবালির আতঙ্ক ততই তাকে আড়ষ্ট করে রাখে।

প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস কি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ফর হুম দি বেল টোলস' পড়েছেন? হয়তো পড়েছিলেন। তাই তাঁর চোখ-মুখে এত ভয় ও হিংস্রতার আনাগোনা। রেজি দ্যব্রেকে পাকড়াও করবার পর ভেবেছিলেন, এবার হয়তো চে কে ধরা যাবে। চেষ্টারও কোন কসুর নেই। সি-আই-এ-র পাণ্ডাদের সাথে হাত মিলিয়ে চারদিকে জাল পেতেছেন। কিন্তু সবটাই কাকস্য পরিবেদনার সামিল। গেরিলারা

ইতি উতি আক্রমণ চালায়। সরকারী সৈন্যও জবাব দেয়। তারপর আবার নিশ্চুপ। ওরা যেন কর্পুরের মত উবে যায়। যে লোকটা কিউবার জঙ্গলে, মেক্সিকোর প্রান্তরে, কেনিয়ার গহনে, ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষের মধ্যে অনায়াসে লীন হয়ে যেতে পারেন এবং বলতে পারেন, 'এখন শুধু চোখের সামনে আগুন আর অগ্নিকুণ্ড; যা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে মুঠো মুঠো আলো', বারিয়েনতোস বলিভিয়ায় তাঁর ভয়াবহ উপস্থিতির খবর জানতে পেরে কী ভাবে আর স্থির থাকতে পারেন?

আতঙ্ক আর বিকার যত ফেনিয়ে ওঠে, রেজি দ্যব্রের উপর বারিয়েনতোসের অত্যাচার তত বেড়ে চলে। যে মানুষ 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'-এর মতো ভয়াবহ থিয়োরী রচনা করতে পারেন, বারিয়েনতোস তাঁকে দুনিয়ার শত্রু বলে মনে করেন। দ্যব্রের উপর পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন তিনি। দ্যব্রের মুখোমুখি তিনি হিংস্র; আর চে'র প্রসঙ্গ উঠলেই আতঙ্কে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠেন। আর একটা 'দিয়েন বিয়েন ফু' যেন প্রতি মুহূর্তেই ঝলসে উঠছে তাঁর চোখের সামনে। গেরিলারা এত দ্রুত জায়গা বদল করতে পারে যাতে সরকারী বাহিনীর মধ্যে দারুণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। কোন অপারেশনই সঠিক লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ শানাবার সুযোগ পাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ভিয়েতনামে। ভিয়েতনামের ছায়া বুঝি আলম্বিত সুদূর বলিভিয়ার বুকেও। একবার শোনা গেল সান জুয়ানে গেরিলারা জমায়েত হয়েছে। বলিভিয়ান আর্মি ছুটে যায় সেখানে। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পর শোনা গেল, রিও গাঁদে সরকারী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে গেরিলারা। আবার তাই গতি-পরিবর্তন। সরকারী বাহিনী ক্রমশই হাঁপিয়ে উঠছে। একমাত্র সান্ত্বনা, দ্যব্রেকে কয়েদ করা গেছে। কামিরির মিলিটারী ক্লাবে দ্যব্রেকে আটকে রাখা হয়েছে। দ্যব্রের বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে মার্কিন দূতাবাসের

ঝানু কূটনীতিবিদ্‌রা সাহায্য করছেন প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসকে। মার্কিন দূত মিঃ ফাউলার স্বয়ং দ্যব্রের সাথে দেখা করেছেন, খবর আদায় করবার জন্য।

মিঃ ফাউলার দ্যব্রের কাছে প্রস্তাব রাখলেন : বলিভিয়ার জঙ্গলে একবার যখন আপনি গ্রেপ্তার হয়েছেন, তখন আপনাকে মুক্ত করা খুবই কঠিন, প্রায় অসাধ্য বলতে পারেন। তবে একটা জিনিস করলে, আপনার মুক্তির জন্য আমি লড়বো। আপনি স্বীকার করুন, আপনার এতদিনের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভুল। বলুন, মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ বর্তমান যুগে অচল। আপনার নিজের 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' একেবারে অসার।

ফাউলার তাঁর কথা শেষ করলেন।

দ্যব্রের মুখে এতটুকু পরিবর্তনের আভাস নেই। শুধু একবার ফাউলারের মুখের দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে নিছক ঘৃণা ও উপেক্ষা।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফাউলার সরে এলেন।

দ্যব্রের উপর অত্যাচার আরো বেড়ে গেল।

দ্যব্রে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলেন। কিন্তু একটা জিনিস মানতেই হবে, কিউবায় গেরিলারা যেমন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে একাত্ম হ'য়ে যেতে পেরেছিল, বলিভিয়ায় কিন্তু তেমন ঘটছে না। এখানকার পার্টি-নেতারা এই সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী নন। গেরিলাদের তাঁরা তো কোন সাহায্যই করছেন না, পরন্তু পিছন থেকে ছুরি মারছেন। নেতাদের এই ব্যবহারে পার্টির তরুণ সদস্যদের একটা অংশ ক্রমশই বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। তারা চে গুয়েভারার সাথে যোগাযোগ করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে।

বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সি. পি. বি.-র জবরদস্ত নেতা মোন্‌জে তো ইতিমধ্যেই গেরিলা যুদ্ধের উপর বিষোদ্গার করতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, গেরিলারা প্রকৃত জন-দরদী নয়। বরং ওদের কার্যকলাপে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে যাচ্ছে।

দ্ব্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। খুব কম লোকই তাঁর সাথে দেখা করতে পারছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গা ফেটে রক্ত ঝরছে দ্ব্রের। তাঁর যাবতীয় কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দৈনিক আট থেকে দশ ঘণ্টা ধরে জেরা করা হচ্ছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সমস্ত প্রশ্নই আবোল তাবোল, অর্থহীন। দ্ব্রের শুধু সেই এক কথাঃ রামানো সম্পর্কে আমি এখনই কিছু বলতে রাজি নই। আপনাদের স্বৈরাচারী অত্যাচারেও নয়।*

দ্ব্রে গুয়েভারা সম্পর্কে এই মুহূর্তে মুখ খুলতে রাজি নন। কিন্তু তাঁর সহযোদ্ধা রোবার্ত বুস্তস্ ইতিমধ্যেই মুখ খুলেছেন। বলিভিয়ান সরকারের হুমকির কাছে মাথা নত করেছেন। গড় গড় ক'রে অনেক খবরই বলে গেলেন বুস্তস্।

'…ঐ দ্ব্রে বড় সাধারণ লোক নন। সাংবাদিকতার পরিচয়টা একটা মোড়ক মাত্র। আসলে উনি এসেছিলেন চে'র নেতৃত্বে বলিভিয়াতে গেরিলা-অপারেশন দেখতে। কিন্তু বিপ্লব যে বাস্তবে এতটা রূঢ়, তা বোধহয় কল্পনা করতে পারেন নি। বড় ঘরের আদুরে সন্তান, কলমের মুখে বিপ্লবের অনেক বড় বড় তত্ত্ব ও তথ্য উজার করে দিতে পারেন, কিন্তু আদিম জঙ্গলে গেরিলা-তৎপরতার সামিল হবার মতো মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা তাঁর কোথায়?

রামানো নিজে রেজি দ্ব্রেকে নিয়ে খুব বিব্রত হ'য়ে পড়েন। এমন মানুষ ভালো তত্ত্বের জন্ম দিতে পারেন, কিন্তু স্টেনগান হাতে পোড়া রুটি চিবিয়ে দিনের পর দিন জীবন-মরণ লড়াই চালাতে পারেন না। গুয়েভারা তাই দ্ব্রেকে য়ুরোপে ফিরে যেতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, ফিরে গিয়ে বলিভিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের সমর্থনে ঝড় তুলুন। আপনার সে-কাজের মূল্য হবে অনেক বেশী।

---

* চে গুয়েভারা বলিভিয়ান গেরিলাদের মধ্যে 'রামানো' নামে পরিচিত ছিলেন।

দ্যব্রে গুয়েভারার যুক্তিকে মেনে নিলেন্। চে স্বয়ং তাঁকে মুয়ুপম্পার জঙ্গল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসবার মুহূর্তেই দ্যব্রে ধরা পড়ে গেলেন।…'

বুস্তসের এমন কনফেশান-এর পর বলিভিয়ান সরকার আরো চেপে ধরেছেন দ্যব্রেকে। বেড়েছে আরো অত্যাচার। দ্যব্রের উপর এই নির্যাতনের খবর যাতে বাইরে পাচার না হয়ে যায়, তার জন্য প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের সতর্কতার অন্ত নেই। তবু কিছু খবর এরই মধ্যে য়ুরোপে পৌঁছে গেছে। আন্দোলন দানা বাধছে দ্যব্রের মুক্তির দাবীতে।

রেজি-জনক জর্জ দ্যব্রে স্বয়ং ছুটে এসেছেন লা-পাজে। বলছেন : আমার ছেলেকে মুক্ত করবার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমি করবো।

কিন্তু কি ভাবে?

বারিয়েনতোস কি প্রকাশ্য আদালতে দ্যব্রেকে তুলে আনবেন? সে সাহস তাঁর হবে না। জনতার সামনে প্রকৃত সত্য নগ্ন হ'য়ে পড়বে। বিক্ষোভের ঝড় উঠবে। সে-সবের ঝুঁকি বারিয়েনতোস নিতে পারবেন না। একমাত্র মিলিটারী ট্রাইবুনালে এর বিচার হতে পারে।

হাঁ, তাই।

দ্যব্রের সাথে দেখা করবার জন্য সকলেই উৎসুক। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আবেদন আসছে, দ্যব্রের সাথে দেখা করতে দেবার সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু বারিয়েনতোস সমস্ত আবেদনই নাকচ করে দিচ্ছেন। বার্ট্রেণ্ড রাসেলের ব্যক্তিগত দূত মিঃ সোহেনমানকে তিনি কামিরিতে ঢুকতে দেন নি। দ্যব্রের 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'-এর প্রকাশক সিনিওর ফেলত্রিনিল্লিকে পর্যন্ত তাঁর লেখকের সাথে দেখা করতে দেওয়া হলো না।

সিনিওর ফেলত্রিনিল্লি ঘোষণা করলেন : দ্যব্রের মুক্তির জন্য আমি

শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবো। ওর জন্য যত খরচ হোক, আমি-ই তা যোগাবো।

যাঁকে নিয়ে এমন হৈ চৈ, এত আলোচনা ও বিতর্কের ফুলঝুরি, অতটা সতর্কতা, সেই 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'-এর লেখক রেজি দ্যব্রে কিন্তু তখন সদ্য জিজ্ঞাসাবাদের যন্ত্রণা এড়িয়ে ভাবনার অতলান্তে ডুব দিয়েছেন। তিনি বয়সে তরুণ। পৃথিবীর সর্বত্র আজ তরুণদের ভীতির চোখে দেখা হচ্ছে। ওরা নাকি আর সৃষ্টির জয়গানে মুখর নয়। ওদের নাকি এখন চলেছে নিছক ধ্বংসের সাধনা। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? প্রাচীন বটবৃক্ষের দল কি এর জবাব দিতে পারবেন? শোষণ, পীড়ন ও অবজ্ঞার শতাব্দী ব্যাপি অনাচারের ফলশ্রুতি নয় এ-সব?

দ্যব্রে বলছেন, তারুণ্যের অভিষেক হবে বিপ্লবের বিজয়-ঘোষণায়। তরুণরা নিছক ভাঙ্গার হাতিয়ার নয়। নিছক বিদ্রোহ তার চেতনায় ঘুরপাক খায় না। একজন সচেতন তরুণ আজকের সমাজে যা ভাবে, তা হলো বিপ্লবের রূপরেখা। বিপ্লব মানেই ধ্বংস নয়। পুরনো জঞ্জাল সরিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তুলবার মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবের সার্থকতা। যিনি তারুণ্যের অধিকারী নন, তিনি বিপ্লবীও নন।

লেনিন, মাও, গুয়েভারা, কাস্ত্রো, গিয়াপ সকলেই এই তারুণ্যের অধিকারী। দ্যব্রে নিজেও।

মনে পড়ে, মেক্সিকোর সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের কথা। দুই গেরিলা-নায়ক পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। ফিদেল কাস্ত্রো এবং আর্নেস্ট চে গুয়েভারা।

আবেগে-পুলকে গুয়েভারার একখানা হাত চেপে ধরলেন কাস্ত্রো: কিউবার লক্ষ লক্ষ জনতার মুক্তি-সংগ্রামে আপনাকে আমাদের বড়ো প্রয়োজন।

গুয়েভারা হাসলেন। বিস্ময়ে কাস্ত্রো দেখলেন, এ যে সেই শানিত হাসি, যাতে তিনি স্বয়ং অভ্যস্ত।

চিন্তানায়ক সার্ত্রে বলেছেন: আমি বিশ্বাস করি, আর্নেস্ট চে গুয়েভারা শুধু একজন চিন্তাবিদ নন, তিনি হলেন আমাদের কালের সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানুষ।

আর ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে গিয়ে চে বলেছিলেন: আমরা আমাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এমন মানুষ তৈরি ক'রে যাবো, যাদের মধ্যে উনিশ এবং বর্তমান শতকের অপরাধ ও ক্ষয়িষ্ণু চেতনা বিন্দুমাত্রও থাকবে না। সে হবে একুশ শতকের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যাকে তৈরি করা আমাদের সাধনা।

ছোটবেলা থেকেই ক্ষীণ স্বাস্থ্য,—দুরারোগ্য হাঁপানির টানে বুক ভরে দম পর্যন্ত নিতে পারতেন না গুয়েভারা। কিন্তু অসাধারণ মানসিক বলে সেই শারীরিক অক্ষমতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন তিনি। তিনি অনুভব করতে পারতেন, লাতিন অ্যামেরিকা তথা তামাম দুনিয়ায় শোষিত জনগণের মুক্তি সংগ্রামে তাঁর একটা ঐতিহাসিক কর্তব্য রয়েছে। লাতিন অ্যামেরিকার এখানে ওখানে বিপ্লবের যে আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে, গেরিলা-যুদ্ধের তৎপরতায় সেই ছাই চাপা আগুনকে দাবানলের রূপ দেবেন তিনি।

তাই কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোকে দেখে আদর্শবাদী তরুণ গুয়েভারা দারুণ খুশী হলেন। তাঁর মনে হলো, এতদিনে তিনি তাঁর যথার্থ সহযাত্রীকে খুঁজে পেয়েছেন। চে'র নিজের কথায়: যে আদর্শের সন্ধানে আমার চব্বিশ বছরের অশান্ত যৌবন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তিনি [কাস্ত্রো] আমায় সেই শীর্ষে হাত ধরে পৌঁছে দিলেন।...ফিদেল আমার চোখের সামনে এমন এক আশ্চর্য আলো এনে ফেললেন, যার সাহায্যে আমি শুধু আমার অতীত আর বর্তমানকে দেখলাম না, দেখতে পেলাম আমার

ভবিষ্যৎকেও।…আমি ফিদেলকে আঁকড়ে ধরে যেন বিপ্লবকেই আঁকড়ে ধরলাম। আর ভুল নেই।…

কাস্ত্রোর সাথে দেখা হবার আগে গুয়েভারা এই বিপ্লবের সন্ধানে লাতিন অ্যামেরিকার দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু সব জায়গাতেই তিনি দেখেছেন, সুবিধাবাদীদের স্বর্গভূমি রচিত হচ্ছে। সংগ্রামের নামে তারা আপোষ করে, ডলারের মোহে আদর্শকে বলি দেয়।

কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর মানুষ। আপোষ দূরের কথা, জনতাকে যথেষ্ট সচেতন না করেই তিনি সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কারণ, কাস্ত্রো জানতেন, গেরিলাদের এই দুঃসাহসী আক্রমণ ধীরে ধীরে অত্যাচারিতের মনে সাহসের সঞ্চার করবে, তারা এগিয়ে আসবে।

কাস্ত্রো আর গুয়েভারা হাতে হাত মিলিয়ে সংগ্রামে নামলেন। হাতে সময় কম। কিন্তু প্রস্তুতি হবে বিরাট। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলবেন তাঁরা। কাস্ত্রো ও গুয়েভারা তাঁদের দলবল নিয়ে গেরিলা যুদ্ধের তালিম নিতে থাকেন স্প্যানিশ সমরবিদ্ এলবার্তো বেয়োর কাছে। প্রস্তুতি শেষে ১৯৫৬ এর নভেম্বরে কাস্ত্রো ঘোষণা করলেন: ১৯৫৬ সালের মধ্যে আমরা মুক্তি অর্জন করবো অথবা, শহীদের মৃত্যু বরণ করে নেবো।

মেক্সিকোতেই কাস্ত্রোর মধ্যস্থতায় হিলদা গেদে-র সাথে গুয়েভারার বিবাহ হয়।…কিউবার গেরিলা যুদ্ধে গুয়েভারা শুধু স্টেনগান নিয়ে লড়াই করেন নি, একজন দক্ষ চিকিৎসক হিসাবেও বহু আহত যোদ্ধাকে তিনি নতুন জীবন দান করেছিলেন। কাস্ত্রো সবিস্ময়ে দেখছিলেন, অসাধারণ সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে গুয়েভারা একের পর এক অসাধ্যসাধন ক'রে চলেছেন। একটির পর একটি রণাঙ্গনে বাতিস্তার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করছেন। কাস্ত্রো তাঁকে

গেরিলা-বাহিনীর সর্বোচ্চ পদ 'মেজর'-এ উন্নীত করেন। যুদ্ধ করতে করতে অনেকবার আহত হয়েছেন গুয়েভারা। একাধিকবার অপারেশন করে তাঁর শরীর থেকে বুলেট বের করতে হয়েছে। কাস্ত্রো তাঁকে সতর্ক হবার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু চিরতরুণ গুয়েভারা বেপরোয়া, কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতিই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না।

বন্যায় যেমন মস্ত মস্ত ঢল নামে, গেরিলারাও তেমনি উঁচু থেকে নীচুতে অপ্রতিরোধ্য গতিতে নেমে আসতে থাকে। সিয়েরার গাছ-গাছালি কাঁপিয়ে মস্ত মস্ত পাথরের চাঁই ঠেলতে ঠেলতে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠতে থাকে এক একজন দুর্দ্ধর্ষ গেরিলা। প্রথমে তারা ছুটে চললো গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে। আগে গ্রামের মুক্তি, তারপর ক্যান্টনমেণ্ট। গ্রামের লোকেরাই বিপদে গেরিলাদের আশ্রয় দেয়, সংগ্রাম-লগ্নে হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। গ্রামগুলিতে মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলে শহরের দিকে এগিয়ে চললেন গুয়েভারা। সাথে তাঁর এক নারী গেরিলা—এলিদা।* সাহসিকতায় ও রণনিপুনতায় এলিদা যে কোন পুরুষ যোদ্ধার চেয়ে কম ছিলেন না। লা-ভিলা অভিযানে গুয়েভারা তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন।

চৈনিক সমরনায়ক লিন পিয়াও-র মতো চে তখন তাঁর মুক্তি বাহিনী নিয়ে অজেয় হ'য়ে উঠেছেন। প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য আর ক্রমাগত অগ্রগতি। বাতিস্তার বাঘা বাঘা জেনারেলরা ছত্রাকার হয়ে যাচ্ছেন। অতি আধুনিক মার্কিন সমরাস্ত্রও কোন কাজে লাগছে না।

কঠিন জীবন। মরণপণ সংগ্রাম। তবু তারই মধ্যে সময় ক'রে নেন গুয়েভারা। যতটুকু অবসর পান, পড়েন ও লেখেন। রাতে ঘুম নেই। চে তখন মার্কসের ক্যাপিটাল পড়ছেন। আরো রাত

---

* গুয়েভারার দ্বিতীয় স্ত্রী। চে'র জীবনে যে সব নারী এসেছিলেন, গেরিলা-নায়িকা এলিদা তাঁদের অন্যতমা। চে তাঁর প্রথম স্ত্রীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ক'রে এলিদাকে বিবাহ করেছিলেন।

ঘনিয়ে আসবার পর বই বন্ধ ক'রে চে লিখতে সুরু করলেন। তাঁর আত্মস্মৃতি, গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও নির্দেশনা।

চে'র সেই সব দিনগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর এক সহযোদ্ধা দালমাউ বলেছেন: চে মার্কস এবং লেনিনের সমস্ত রচনাই পাঠ করেছেন। মার্কসবাদ নিয়ে যাঁরা যত ভাষ্য রচনা করেছেন, চে তাঁদের প্রত্যেকের মন্দিরে প্রবেশ করেছেন। সমস্ত আর্জেন্টিনানদের মতো তাঁরও নিজস্ব মতামত ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, যদিও যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার না ক'রে তিনি কোন মত গ্রহণ করতেন না।

সংগ্রাম সফল হলো।

কিউবান গেরিলা বাহিনী রাজধানী হাভানা অধিকার ক'রে নিলো। একদিন ম্যানকাড দুর্গ আক্রমণ ক'রে ফিদেল কাস্ত্রো যার সূচনা করেছিলেন, তারই চূড়ান্ত পরিণতিতে কিউবার মুক্তি ঘটলো চে গুয়েভারার গেরিলা নেতৃত্বে।

নতুন স্বাধীন বিপ্লবী কিউবার দ্বিতীয় রাষ্ট্রপ্রধান হলেন চে গুয়েভারা। এখানেও কাস্ত্রোর সাথে হাত মিলিয়ে দেশ-গঠনে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তিনি। পৃথিবীর বহু দেশে ছুটে গেছেন কিউবার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য। রাত দুটোর আগে একদিনও তিনি বিশ্রাম নেবার সুযোগ পেতেন না। ওরই মধ্যে তিনি অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অধিকাংশ চিঠিরই উত্তর তিনি নিজের হাতে দিতেন। জাতিসঙ্ঘে ছুটে গেছেন, সমবেত রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে মার্কসবাদের আলোকে কিউবান বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন:

"...The Cuban Revolution takes up Marx at the point where he himself left science to shoulder his revolutionary rifle. And it takes him up at that point, not in a revisionist spirit, of struggling

against that which fallows Marx, of reviving 'pure' Marx, but simply because up to that point Marx, the scientist, placed himself outside of the history he studied and predicated....."

কিউবার জন্য চে অনেক দিয়েছেন। কিউবার বিপ্লবকে সফল করতে তাঁর যতটুকু ভূমিকা, তিনি তা পালন করেছেন। এমন কি বিপ্লব-উত্তর দেশটিকে গড়ে তুলতেও অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন।

কিন্তু আর কেন? আর কেন তিনি এ দেশের বৈভবে ও সুখে দ্বিতীয় রাষ্ট্র প্রধান হয়ে থাকবেন? মন যে তাঁকে টানছে সংগ্রামের আরো বিস্তৃততর পটভূমিতে।

'আফ্রিকায় ঘুরে বেড়াবার সময় আমার দৃষ্টির সামনে যেন এক নতুন দিগন্ত বিস্তারিত হ'য়ে এলো।....আমি যোদ্ধা, আমি আজীবন বিপ্লবী। অত্যাচারে পীড়িত তামাম দুনিয়ার আকুল ডাক প্রতিনিয়ত আমার কানে এসে বাজছে। সাম্রাজ্যবাদ এখনো তাঁর অন্ধ অহমিকা বজায় রেখেছে এশিয়ায়, আফ্রিকায়, লাতিন অ্যামেরিকায়। শোষণের সহস্র বাহুতে সেখানে অক্টোপাশের মরণ-বাঁধন।

সমাজতন্ত্রী দেশগুলি আদৌ ঐক্যবদ্ধ নয়। তাদের শিবিরে শিবিরে অনেক গোলমাল, হরেক মতের ঠোকাঠুকি, পারস্পরিক বিরোধ পর্বতপ্রমাণ। এই বিরোধের পরিপূর্ণ সুযোগ দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।

ভিয়েতনামের উপর চলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন বর্বরোচিত বীভৎস আক্রমণ—সেই আক্রমণ বিস্তারিত লাওস ও কাম্বোডিয়ায়। শান্তি কোথাও নেই।

আফ্রিকার প্রতিটি দেশ এখনো সাম্রাজ্যবাদের ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী অস্বীকৃত। লাতিন অ্যামেরিকার মানুষ নেতৃত্বের গলদে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ, গুয়েতেমালা, কলম্বিয়া, চিলি,

পেরু, উরুগুয়ে, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা—অসন্তোষের আগুন কোথায় না ধিকি ধিকি ক'রে জ্বলছে?

এ সব ব্যাপারে আমার কি কিছুই করণীয় নেই?···

কিউবার সমাজতন্ত্র আমায় অনেক দিয়েছে। কিন্তু তার বদলে আমি তো এ দেশকে আমার সবই দিয়েছি। নিজের বলতে আমি কিছুই আলাদা করে রাখি নি।

তবু কেন কিউবার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবো? মৃত্যু ভয় আর বয়সের ভারে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন জীবনটাকে এভাবেই কাটিয়ে দিতে চাই বলে? আমার ভেতরের বিপ্লবের আগুন কি ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে?···'

মনের জ্বালায়, বিপ্লবের তাগিদে, দুনিয়ার মুক্তিকামী জনতার ডাকে আর্নেস্ট চে গুয়েভারা একদিন রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন। কিউবার মাটি থেকে শেষ বারের মতো পা তুলে নিলেন।

সি-আই-এ অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ওঠে। অতি বিপজ্জনক এই লোকটি আবার হয়তো কোথাও বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলছেন, আবার হয়তো পৃথিবীর কোন কেন্দ্রে আশ্চর্য গেরিলা-তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে।

দিকে দিকে খোঁজ পড়ে গেল। দেশে দেশে অত্যাচারী, ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সরকার শঙ্কাকুল মনে ভাবেন—এই বুঝি তাঁদের দেশের কোন গহন বনে অথবা, পাহাড়ের সানুদেশে শোনা যাবে গুয়েভারার দুর্বল ফুসফুসের অমানুষিক হাহাশ্বাস! গুয়েতেমালায় গেরিলা-তৎপরতা বৃদ্ধি পেলো। সরকারী বাহিনী পদে পদে নাজেহাল। সরকার সন্দেহ প্রকাশ করলেন: সম্ভবতঃ চে গুয়েভারা গুয়েতেমালায় এসে ঢুকেছেন।

তারপর কলম্বিয়া। হঠাৎ সেখানকার গেরিলারা এমন উদ্যম পেলো কোথা থেকে? কলম্বিয়ার আর্মি হেডকোয়ার্টারের উপর

আক্রমণ চালিয়েছে তারা। অনেকগুলি কনভয় উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর নিখুঁত তৎপরতায় যেন বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেল। এমন আশ্চর্য নিপুনতায় স্পষ্টই গুয়েভারার ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

আবার শোনা গেল, ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে নাকি গুয়েভারার আবির্ভাব ঘটেছে। গিয়াপের রণকৌশলের সাথে গুয়েভারার সাহস ও আত্মবিশ্বাস একাকার হয়ে গেছে।

সবশেষে এই বলিভিয়া!

ঃ বলুন, গুয়েভারা বলিভিয়ার জঙ্গলে গেরিলা-তৎপরতা চালাচ্ছেন কিনা!

দ্যব্রে মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন, আবার সেই নোংরা জিজ্ঞাসাবাদের সময় এসে গেছে। হঠাৎ রুখে দাঁড়ালেন তিনি, প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলেনঃ হাঁ, আমার রামানো বলিভিয়াকে মুক্ত করবেন।

পরিষ্কার জবাব পেয়ে সচকিত হয়ে ওঠেন বারিয়েনতোস। আতঙ্কে, আশঙ্কায় তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে। চে'র উপস্থিতি তবে নিশ্চিত। বলিভিয়ায় বিপ্লব আমদানি করতে এসেছেন তিনি। সৃষ্টি করতে এসেছেন দ্বিতীয় ভিয়েতনাম। ক্ষিপ্ত প্রেসিডেন্ট ফোন তুলে নিলেন, ডায়াল করলেন মার্কিন দূতাবাসে।...

গুয়েভারার 'গেরিলা যুদ্ধ' যারা পড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন, বলিভিয়াতে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে চে'র প্রবণতা স্বাভাবিক। তিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এর ভৌগলিক পরিস্থিতির উপর। লাতিন অ্যামেরিকার পাঁচটি দেশের সাথে এর সীমান্ত লেগে রয়েছে, যার ফলে গেরিলারা যে কোন সময়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে সমূহ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। আবার সুযোগ মতো এগিয়ে এসে আক্রমণ শানাবার ও চমকপ্রদ

ব্যবস্থা এখানে সম্ভব। তার উপর রয়েছে বলিভিয়ার ছোট ছোট পাহাড় এবং দুর্ভেদ্য জঙ্গল, যা গেরিলাদের কাছে স্বর্গভূমি বলে মনে হবে।

এতো গেল সুবিধার কথা।

কিন্তু এখানে গেরিলা-যুদ্ধের অসুবিধাও অনেক। চে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, সমস্ত রকম বিপদকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবার নেশা তাঁর রক্তে। এ ধরণের সাহসিকতা কিউবায় স্বর্ণফল প্রসব করেছিল। কারণ, সেখানে প্রতিবিপ্লবীদের প্রস্তুতি প্রায় ছিল না বললেই চলে।

কিন্তু বলিভিয়ায় পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে প্রতিবিপ্লবীদের শক্তি অসাধারণ। এখানকার কমিউনিস্ট পার্টি গেরিলা-যুদ্ধ পছন্দ করে না। চে'র বিরুদ্ধে তারা কুৎসা রটায়। তারপর কিউবার ঘটনা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শিক্ষা গ্রহণ করেছে। চিলির সাথে বিপ্লবও রপ্তানি করবার সুযোগ সে আর কিউবাকে দেবে না। আজ তাই লাতিন অ্যামেরিকার দেশে দেশে মার্কিনরা এ্যান্টি গেরিলা ট্রেনিং ক্যাম্প তৈরি করেছে। পানামা এর হেডকোয়ার্টার। পানামা থেকে একদল বিশেষজ্ঞ ইতিমধ্যেই এসে নেমেছে বলিভিয়ায়। বলিভিয়ার জঙ্গলে গুয়েভারার সন্ধানে শুরু হয়ে গেছে তাঁদের ব্যাপক আক্রমণ ও তল্লাসি। গ্রীন ব্যারেট রেঞ্জার ডিভিশন ক্রমশই বলিভিয়ার বনগুলিকে ঘিরে ফেলছে। গুয়েভারাকে আর পালিয়ে যাবার সুযোগ দিতে রাজি নয় তারা।

নির্যাতিত দ্যব্রের কপালে চিন্তার কুঞ্চন। রামানো কি এবারেও গা ঢাকা দিতে পারবেন? ভয় হয়। কামিরি বনাঞ্চলকে ঘিরে ফেলেছে শত্রু পক্ষ। কিউবান গেরিলা, গুয়েভারার অন্যতম সুহৃদ জোয়াকুইন নিহত। একটা গোটা গেরিলা ইউনিট নিশ্চিহ্ন। ভয়েস অফ্ অ্যামেরিকা জানিয়েছে: এই যুদ্ধে চে গুয়েভারার শ্রেষ্ঠ গেরিলা

বন্ধুরা খতম হয়ে গেছেন! সবচেয়ে বড় খবর, দলের একমাত্র নারী গেরিলা তানিয়াও নিহত হয়েছেন!

তানিয়া!

তানিয়া আর নেই!!

অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় এবার যেন ভেঙ্গে পড়লেন রেজি দ্যব্রে। কোথায় যেন একটা বিরাট গলদ থেকে গিয়েছিল। সেই ভুলের মাশুল গুণতে একে একে প্রতিটি প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। জোয়াকুইনের পর তানিয়া। এরপর কি স্বয়ং আর্নেস্ট চে গুয়েভারা?

লাতিন অ্যামেরিকার গেরিলা-যুদ্ধের ইতিহাসে তানিয়া এক বিস্ময়কর নারী-চরিত্র। পুরো নাম তাঁর হেদি তামারা বাঙ্কি। বাবা জার্মান আর মা রাশিয়ান ইহুদি। তানিয়ার কৈশোর অতিবাহিত হয় পূর্ব জার্মানীতে। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যা ছিলেন। যথেষ্ট প্রতিভা, চমৎকার বাচন-ভঙ্গী, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

বাইশ বছর বয়সে প্রথম লাতিন অ্যামেরিকায় তাঁর আবির্ভাব। কিউবার রাজধানী হাভানায় কিছুদিন ছিলেন। তারপর আবার ফিরে যান পূর্ব জার্মানীতে। এর আরো তিন বৎসর বাদে তানিয়া কিউবায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এলেন। ভর্তি হলেন হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কিউবার বিপ্লবে গুয়েভারার ভূমিকা তানিয়াকে তাঁর জীবনের আদর্শের সন্ধান দিয়েছিল যেন। গুয়েভারা আত্মগোপন করবার মাত্র কয়েকদিন আগেই তানিয়াও বিপ্লবের আগুন ছড়াতে কিউবার মাটি থেকে পা তুলে নেন।

যতদূর জানা যায়, হাঁটা পথে তিনি এসে ঢোকেন বলিভিয়ায়। এক ভুয়া পাশপোর্টও সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর তখন নতুন নাম হয়েছে লয়রা বেউয়ের। নিজের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের উপর মহলের

অনেকেরই মন জয় করে নিতে তাঁর দেরী হয়নি। এমন কি একাধিক দেশের কনস্যুলেটে তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। এক প্রভাবশালী ভদ্রলোকের সাথে তাঁর বিবাহও হয়। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে সেই বন্ধন তাঁকে ছিন্নও করতে হয়েছে।

রেজি দ্যব্রে যখন তানিয়ার সাথে প্রথম পরিচিত হন, তখন এই রহস্যময়ী যুবতী খুব সতর্কতার সাথে গেরিলাদের দপ্তরে সরকারী খবর পাচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। তানিয়ার মারফৎই দ্যব্রে বলিভিয়ার জঙ্গলে চে গুয়েভারার সাক্ষাৎ পান। চে প্রীতির উষ্ণতায় দ্যব্রেকে গ্রহণ করলেন। তাঁর 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' নিয়ে অনেক তাত্বিক আলোচনাও হলো। কিন্তু চে বুঝতে পারলেন, গেরিলাদের নির্মম জীবনযাত্রার সাথে দ্যব্রে অভ্যস্ত নন। এমন লোকের এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চে দ্যব্রেকে বললেন, বলিভিয়ার বাইরে গিয়ে এখানকার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলুন।

তাই বুস্তস্‌কে নিয়ে ফিরে আসছিলেন দ্যব্রে। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন মুয়ুপম্পায়।······

সেই তানিয়া আর নেই!

কিন্তু শুধু কি তানিয়া? বাতাসে বাতাসে আরো একটি প্রচণ্ড দুঃসংবাদ ভেসে আসছেঃ চে গুয়েভারা ধরা পড়েছেন।··· তিনি গুরুতর আহত! তাঁর মৃত্যু অনিবার্য!

আসল ঘটনা আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিহ্নিত। শত চেষ্টাতেও বারিয়েনতোস সত্য গোপন করতে পারেন নি। এল চুরোর সংকীর্ণ গিরিপথে দু'শ' জনেরও কম গেরিলা নিয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন চে। কি করে যেন এক স্থানীয় গ্রামবাসী টের পেয়েছিল। পুরস্কারের লোভে খবর দিয়ে আসে স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পে।

সাথে সাথে মেজর এয়োরোয়া তাঁর দলবল নিয়ে তীরবেগে ছুটলেন এল চুরোর গিরিসঙ্কটে। ঘিরে ফেললেন তিনি গোটা জায়গাটা।

শুরু হলো উভয় পক্ষের তুমুল গুলিবর্ষণ।

কিন্তু গেরিলারা আর কতক্ষণ লড়বেন? তাঁদের কার্তুজের ভাণ্ডার শূন্য। পালাবার পথও রুদ্ধ। তবু বেপরোয়া চে পালাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন প্রাদোর গুলি এসে লাগলো তাঁর পায়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আর পালাতে পারলেন না। অবশিষ্ট গেরিলারা তাঁদের নেতাকে মুক্ত করবার জন্য জীবনপণ ক'রে লড়েছিলেন। প্রায় সকলেই প্রাণ হারালেন। আহত চে কে মুক্ত করা গেল না।

এর পরের ঘটনা আরো মর্মান্তিক। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস এমন মূল্যবান বন্দীকে আর জীবিত রাখতে চাইছিলেন না। তাঁর মনে ভয় জেগেছিল, হয়তো বন্দী চে কে মুক্ত করবার জন্য পৃথিবীব্যাপি আন্দোলন দানা বাধবে। হয়তো কিউবা ঝাঁপিয়ে পড়বে বলিভিয়ার উপর। রাশিয়া চোখ রাঙাবে। গুয়েভারাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন না তিনি। কারণ, বলিভিয়ার আইনে মৃত্যুদণ্ড নিষেধ।

তাই বারিয়েনতোস আহত চে কে অতি নির্মমভাবে হত্যা করলেন। মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি তাঁর ফুসফুস ও পাঁজরাকে ঝাঝরা করে দিল।

হাভানার বেতার-তরঙ্গে ভেসে এলো ফিদেল কাস্ত্রোর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর। চে'র অজস্র গুণাবলীর উল্লেখ ক'রে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করলেন। বললেন: চে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ।…আমি আমার তরুণ সমাজকে নির্দ্বিধায় বলছি—তোমরা চে কে অনুসরণ করো। তাঁর মতো আদর্শপুরুষ হবার চেষ্টা করো।…

গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাসে মাও সে-তুং, গিয়াপ, কাস্ত্রো, গুয়েভারা প্রত্যেকেই এক একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এঁদের নেতৃত্বে সংগ্রাম

যতদুর এগিয়ে যায়, সাফল্যের সাথে আপাতঃ ব্যর্থতার ক্ষতচিহ্নগুলিও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু ইতিহাসের যেটা অমোঘ বিধান, তাকে কেউ আটকাতে পারবে না।

বলিভিয়ার অঞ্চলে চে নিহত হতে পারেন। সাম্রাজ্যবাদীর উল্লাস আরো তুঙ্গে উঠতে পারে। কিন্তু গণযুদ্ধের মূলসূত্রটি কখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। কিউবার রণ-প্রাঙ্গনে যে গেরিলারা অপূর্ব সাফল্যে উদ্ভাসিত, বলিভিয়ার বনে তাঁদের রক্তই সবুজ পাতা বেয়ে বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে নামছে।

কিন্তু তাই বলে গেরিলা যুদ্ধের ভূমিকাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। গেরিলা সংগ্রামের মাধ্যমে মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে লাল চীনের জন্ম হয়েছে। গেরিলা তৎপরতার মধ্যেই নতুন কিউবার স্ফুরণ। এরই অগ্নি ধারাতে সংগ্রামী ভিয়েতনাম এক নতুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে।

গেরিলা যুদ্ধের টেকনিক সম্পর্কে অবশ্য এক একজন নেতার এক এক অভিমত। কিন্তু প্রতিটি সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অগ্নি-শুদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

মাও সে-তুং-এর অভিমত সংক্ষেপে এর আগেই আলোচিত হয়েছে। এখন প্রসঙ্গক্রমে আসছে গিয়াপের কথা। ভিয়েতনাম ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিকের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপ। গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'গণযুদ্ধ-গণবাহিনী' [People's War—People's Army] থেকে কিছু কিছু প্রাথমিক উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরলাম ঃ

'...ভিয়েতনামী জনগণের মুক্তি সংগ্রাম প্রকৃত অর্থেই এক যুদ্ধ। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো, স্বাধীনতা লাভ, দেশের ঐক্য সাধন, কৃষকদের হাতে তাদের কর্ষিত জমির অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং আগষ্ট বিপ্লবের যাবতীয় সুফলকে রক্ষা করা।

এ জন্যেই এ যুদ্ধের নাম দেওয়া হলো গণযুদ্ধ। বিপুল জনগণকে সুশিক্ষিত করে তোলা, তাদের সমবেত করা এবং তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া এক বিরাট সমস্যা। ··

ভিয়েতনামী জাতির যারা শত্রু, হিংস্র সাম্রাজ্যবাদ তাদের আয়ুধ। এই আয়ুধকে আমাদের চূর্ণ করতে হবে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সমানে মদৎ দিয়ে চলেছে সমস্ত সামন্ত প্রভুরা। এই প্রভুদেরও খতম করা আমাদের সংগ্রামের আর একটি উদ্দেশ্য।

আমাদের মতো অনুন্নত দেশ, যেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষক, সেখানকার মুক্তিযুদ্ধকে স্বাভাবিক কারণেই 'কৃষকদের যুদ্ধে' [Peasant's war] পরিণত করতে হবে এবং কৃষকরা সংগ্রাম করবে শ্রমজীবিদের নেতৃত্বে।

অতএব তামাম জাতিকে আজ ঐক্যবদ্ধ করবার অর্থই হলো সমস্ত গ্রামীণ জাতিকে সংগ্রামে সমবেত করা।

ভূমি সমস্যা এ দেশে অতি গুরুতর। ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যুদ্ধকে বৃহৎ অর্থে বলা চলে, গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এর দুটো প্রধান লক্ষ্য ঃ

[ক] সাম্রাজ্যবাদীদের উৎখাত করা ;

[খ] সামন্ততান্ত্রিক রক্তচোষাদের খতম করা।

প্রথম উদ্দেশ্য সফল হবার পরই দ্বিতীয় কাজে আমরা হাত দেবো।

সদ্য ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে মুক্ত ভিয়েতনাম সামরিক শক্তিতে আদৌ শক্তিশালী নয়। আমাদের অস্ত্রশক্তি অতি সীমিত এবং তেমন অভিজ্ঞতাও আমাদের নেই। আর অন্যধারে ভিয়েতনামের শত্রুরা অতিমাত্রায় শক্তিশালী—তাদের হাতে রয়েছে সমুন্নত অস্ত্র-ভাণ্ডার, ধনকুবের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অকৃপণ সাহায্যও তারা পাচ্ছে।

---

* গিয়াপ এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে ইঙ্গিত করেছেন।

শক্তির ভারসাম্য যদি ব্যাখ্যা করতে যাই, তাহলে দেখবো, আমরা এক অসম যুদ্ধের সামিল হতে চলেছি। আমাদের প্রতিপক্ষ অনেক শক্তিশালী, প্রচুর অস্ত্রবলে ও অর্থবলে তারা বলীয়ান।

কিন্তু আমাদের সাফল্য নিহিত আছে একটি বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে। এই যুদ্ধকে আমরা যত দীর্ঘস্থায়ী করতে পারবো, আমাদের সাফল্যের বনিয়াদ ততই দৃঢ় হয়ে উঠবে। এখানে তাড়াহুড়া করতে যাওয়া মস্ত ভুল। যদি আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তড়িৎ সাফল্যের জন্য লালায়িত হই, তবে সাফল্যের পরিবর্তে বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠবে।

এক দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ প্রতিরোধ সংগ্রামের ভূমিকা আমাদের যোদ্ধাদের নিতে হবে। সাথে সাথে সব দিক দিয়েই আমাদের সাবলম্বী হতে হবে আর শত্রুর যা সম্বল, সেই উপাদানগুলিকে ধ্বংস ক'রে ফেলতে হবে।

এখানে সেখানে অজস্র ছোট খাটো সাফল্য এক মস্ত বিজয়ের সামিল করবে আমাদের। এ ভাবেই শক্তিসাম্য আমাদের অনুকূলেই চলে আসবে। আমাদের যা দুর্বলতা, সেটাই পরিণত হবে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে। চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি এসে যাবে আমাদের হাতে।

আমাদের যুদ্ধকৌশল সর্বদাই এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের রূপ দেবার জন্য পরিকল্পিত।···সংগ্রামী মানসিকতাকে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক মানুষ গ্রহণ করবে। আমাদের বিজয় নির্ভর করবে আমাদের যোদ্ধাদের নৈতিকবল ও সাহসিকতার উপর। এই নৈতিক বলের কাছেই প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও সুবিধা নস্যাৎ হয়ে যাবে।

এই যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবেই গেরিলাযুদ্ধ। ভিয়েতনামের বিস্তৃত-প্রাঙ্গনে গেরিলা তৎপরতা আশ্চর্য সাফল্য আনছে এবং আনবে।

এই পদ্ধতি বনে-পাহাড়ে-উপত্যকায়-বিস্তৃত সমুদ্র চড়ায় সমভাবে

প্রযোজ্য। এ সংগ্রাম চালানো যায় আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে; আবার পুরণো ধরণের অস্ত্র হাতে নিয়েও গেরিলারা সফল হতে পারে; এমনকি খালি হাতেও তারা শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম।

আমরা আমাদের অস্ত্র সংগ্রহ করবো প্রতিপক্ষের কাছ থেকেই। ওদের বিভ্রান্ত করবো, ওদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেবো, সেই অস্ত্র দিয়ে ওদেরই খতম করবো।

যখন শত্রু মরীয়া হ'য়ে ব্যাপক অভিযানে নামবে, দেশের তামাম জনসাধারণ তাদের সামনে এক বিরাট প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলবে। প্রত্যেকটি গ্রামই দুর্ভেদ্য দুর্গ। প্রতিটি জিলায় আছে নিজস্ব বিপ্লবী বাহিনী, যারা স্থানীয় পার্টির নেতৃত্বে শত্রু-নিধনে নামবে। জনতা নিজেরাই আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। তাদের নৈতিকশক্তির কাছে শত্রু বিভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়বে।....

তারপর, আমাদের গেরিলা তৎপরতা এক চলমান যুদ্ধের (Mobile Warfare) রূপ নেবে। মূল ওয়ার জোন উত্তর দিকে শত্রুকে ঘায়েল করতে এটাই সবচেয়ে কার্যকরী গেরিলাপন্থা। এই চলমান যুদ্ধ এগিয়ে যাবে, যত ছড়িয়ে পড়বে, ততই তা শক্তিসঞ্চয় করবে—যোদ্ধাদের সংখ্যা ও সংহতি ততই বেড়ে যাবে। মাত্র এক কোম্পানী যোদ্ধা এই পদ্ধতিতে বিরাট অভিযানের মহড়া নিতে পারে। ধীরে ধীরে তাদের অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে সমুন্নত আগ্নেয়াস্ত্র, ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বারুদ এসে জমা পড়বে বিপ্লবীদেরই হাতে।

From the military point of view, the Vietnamese people's War of liberation proved that an insufficiently equipped people's army, but an army fighting for a just cause, can, with appropriate strategy and tactics, combine the conditions needed

to conquer a modern army of aggressive imperialism…'

গিয়াপের সাফল্যের মূল ধারাটি অনুসরণ করতে তাই আমাদের অসুবিধে হয় না। তাঁর নীতি সফল হয়েছিল; কারণ—it was organised and led by the party of the working class; *The Indo-Chinese Communist Party, now the* Vietnam workers' Party…আরো কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের মতো শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে অকৃপণ সাহায্য ভিয়েতনামী গেরিলারা লাভ করেছে এবং এখনো করছে।

কিন্তু সুদূর বলিভিয়ায় চে তেমন এক 'গণযুদ্ধের' নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। সম্ভবও ছিল না। তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সেখানে প্রতিক্রীয়াশীল। কিউবা ছাড়া গোটা ল্যাতিন অ্যামেরিকায় কোন সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই, যেখান থেকে অবাধে গেরিলাদের জন্য সাহায্য আসতে পারে। কিউবারও এমন সামর্থ্য ছিল না, যাতে সে ইয়াঙ্কিদের সতর্ক বেড়াজাল টপকে বলিভিয়ায় সাহায্য পাঠাতে পারে। অপরপক্ষে, গেরিলাদের শত্রু অতি শক্তিশালী। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা ব্যবস্থার পরিচালক। বিশ্বজোড়া কমিউনিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের যে নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেই প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশ তার নাকের ডগায় আর একটি কিউবা বা আর একটি ভিয়েতনাম সৃষ্টি হতে দেবে কেন?

চে'র সংগ্রামী আত্মা আজ বুঝি তাই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। বলছে: জনতা জাগো, এখনো তুলে নাও অস্ত্র! বারুদকে রাখো শুকনো। সিয়েরার গহন বনে আশ্রয় নাও। লা পাজে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করো। দিগন্তকে রক্তরাঙা আগুনে উদ্ভাসিত করে জানিয়ে দাও, মুক্তিই আমাদের শপথ! মুক্তি আমাদের চাই-ই।

তিন

নিবিড় মেঘের আড়ালে গুমট অস্বস্তিকর আবহাওয়া লা পাজের হতচকিত মানুষগুলিকে আরো ম্রিয়মান ক'রে তুলেছে। গোটা দেশের সবুজ প্রাচীরটা ধ্বসে পড়ছে। একরাশ ব্যর্থতার গ্লানি ফেনার মতো জমে রয়েছে সংগ্রামী মানুষের রক্তে। দু' চোখে হিংসার প্রখর আলো জ্বালিয়ে খাকী পোশাকের লোকগুলি তচনছ ক'রে দিচ্ছে অনেকেরই সুখ ও প্রত্যয়কে। তটস্থ হ'য়ে অনেক উচ্চপদস্থ লোকও বলিভিয়া ছেড়ে পালাচ্ছেন। গুয়েভারার কিছু সংগ্রামী বন্ধুকে তখনো পাকড়াও করতে না পেরে নিস্ফল আক্রোশে মাটির ওপর ভারী বুটের ঠাকাস্ ঠকাস্ ছোবল মারছেন বারিয়েনতোস।

সাইমন বলিভারের দেশ সমস্ত নীতিবোধকে বিসর্জন দিয়ে সি-আই-এ-র হারেমে মুখ লুকিয়েছে। মৃত্তিকার অণুতে অণুতে মিশে রয়েছে স্প্যানিশ অভিযাত্রীর যে নিষ্ঠুরতা, আজকের প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস তাই যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলছেন।

প্রকৃতিও রূপ পাল্টায়। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ-পাহাড় বনের ওপর থেকে শীত তার সাদা কুয়াশার জাল সরিয়ে নিচ্ছে। এখন নিছক ইঁট-কাঠ-লোহা-লক্কড়ের প্রাধান্য চোখে পড়ে। বলিভিয়া তার প্রসন্নতা হারিয়েছে, ভয়াবহ মানসিক অসুস্থতায় পেয়ে বসেছে তাকে। গুয়েভারার বিপ্লবী রক্তের স্বাদ পেয়ে সে আরো হিংস্র, সমস্ত নীতিকে ইয়াঙ্কি-যূপকাষ্ঠে বলি দিতে উদ্যত। মৃত চে কে নিয়েও তাদের কুৎসার অন্ত নেই। ভয়েস অফ্ অ্যামেরিকা চে'র বিপ্লবী চরিত্রের ওপর রংদার কেচ্ছা চড়াবার চেষ্টা করছে।

চে'র 'গেরিলা ফোকো' এবং 'ফোকুইসসো গেরিলেরো' তত্ত্ব যে কত অসাড়, ন্যূইয়র্ক তার দুনিয়া-জোড়া প্রচারযন্ত্রে তাই ব্যাখ্যা

করবার চেষ্টা করছে। নয়া সাম্রাজ্যবাদ এতবড় মওকা যেন এর আগে আর কখনো পায়নি।

মদগর্বী জঙ্গী চেতনায় বলিভিয়ান সরকার যাবতীয় আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ আইন-কানুনকেও বুটের সদম্ভ পেষণে দলিয়ে যাচ্ছেন। দ্যব্রেকে কঠিনতম শাস্তি দিতে সে বদ্ধপরিকর। এর জন্য আইনের আব্রুটুকুও নির্লজ্জের মতো সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

বাট্রেণ্ড রাসেলের প্রতিনিধি মিঃ সোয়েনমানকে অপমান করেছেন প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস। দ্যব্রের সাথে তাঁকে তো দেখাই করতে দেওয়া হলো না। সোয়েনমান বলিভিয়ার সংবিধান থেকে উদ্ধৃতি তুলে বললেনঃ

আইনতঃ রেজি দ্যব্রেকে কয়েদ ক'রে রাখবার কোন এক্তিয়ার বলিভিয়ান সরকারের নেই। দু' মাসের ওপর কাউকে বিনা প্রমাণে বন্দী করে রাখা এ দেশের সংবিধান বিরোধী। দ্যব্রের ওপর যে অত্যাচার এতদিন ধরে চালানো হলো, কোনো আইনে তার সমর্থন মেলেনা। সর্বোপরি, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, বলিভিয়ান সরকার আদালতে দ্যব্রের বিচার চালাতে সাহসী নন। তাঁরা আত্মগোপন করছেন সামরিক ট্রাইবুনালে. সেখানকার কাজীর বিচার সহজেই অনুমেয়।...

সোয়েনমানের উক্তিতে বারিয়েনতোস তেতে লাল। অবাঞ্ছিত লোকটিকে অবিলম্বে বলিভিয়া ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

বিমানে পা দেবার মুহূর্তে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের সুরে সোয়েনমান বললেন:

The military and this Government have destroyed the constitution and therefore the foundation of their right to govern Bolivia. Government's legality and right to continue in

power are being judged in the trial of Regis Debray. *It is the Bolivian Government that is on the stand* for its gross violation of the constitution and, consequently, of the rights of every Bolivian citizen.........The Debray case symbolizes the moral poverty and illegality of this psando—government. Historically it finds its parallel in Dreyfus case, the Sacco and Vanzetti trial, the Rosenberg trial and, indeed, the trial of Fidel Castro.....'

নাৎসী মানসিকতা নিয়ে বলিভিয়ার সামরিক ট্রাইবুনালে রেজি দ্যব্রের বিচার করতে বসলেন বলিভিয়ান সরকার। মধ্যযুগীয় কাজীর বিচার, আইন ও সংবিধান সেখানে অচল। যেন বক্তিয়ার খিলিজীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর দাপট নিয়ে এক দঙ্গল টমিগান-সৈন্য ঘিরে রয়েছে শ্রান্ত অত্যাচারিত বন্দী রেজি দ্যব্রেকে। দ্যব্রের স্বর্ণাভ চুল আছড়ে পড়েছে কপালের ওপর, দীর্ঘ অনিদ্রায় ও শারীরিক অত্যাচারে স্নিগ্ধ মুখের ওপর বেশ কয়েকটি রেখার কুঞ্চন দেখা দিয়েছে, প্রচণ্ড স্নায়ুর চাপে শিথিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। শুধু তাঁর চোখ তুটি জ্বলছিল। অস্বাভাবিক দীপ্তি নিয়ে জ্বলছিল।

বিচারের প্রহসনেও আসামীকে আদালতের সামনে তু' চার কথা বলবার সুযোগ দেওয়া হলো। দ্যব্রে উঠে দাঁড়ালেন। শারীরিক তুর্বলতা সত্বেও। যেমন ভঙ্গীতে তিনি এগিয়ে এলেন, তা চমকে উঠবার মতো। বোঝা যায়, দ্যব্রে প্রস্তুত—জঙ্গী জমানার যে কোন রক্তচক্ষু বিধানের জন্য তিনি প্রস্তুত। হয়তো কাস্ত্রোর মতো তাঁরও প্রত্যয়, এই সাবেকী শোষণতন্ত্র একদিন ভেঙ্গে পড়বে এবং ইতিহাস তাঁকে মুক্ত করবে! অথবা, যদি নিভতেই হয়, তা হলে বুক-জ্বালা প্রদীপের মতো অন্তিমে আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে যাবেন তিনি।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই শেষ মরণ কামড়ে দুনিয়া জোড়া হাহাকার ও মন্বন্তর হয়তো নেমে আসবে। তবু উদ্ধত জাগ্রত গণরোষের কাছে দিনের পর দিন জঙ্গী আক্রোশে একরকম আত্মহত্যার মতোই নিজেদের শেষ করে ফেলবে ধনবাদী দুনিয়া। আসছে নয়া জমানা। বলিভিয়ার মদগর্বী সরকার যতই দাপট দেখাক না কেন, পারিপার্শ্বিক পৃথিবীটা নিষ্ক্রিয় আর নিশ্চল হ'য়ে থাকবে না। দুনিয়ার সংগ্রামী জনতা এক—দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে তারা অভিন্ন। দিন বদলেছে, কালের হাওয়াও বইছে অন্যধারে। এককালে সামন্ততন্ত্রকে গ্রাস ক'রে শীর্ষ শিখরে বসেছিল বণিকতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ যাদের অস্ত-প্রত্যস্তে লেগে রয়েছে। আজ তাকেও প্রব্রজ্যা সহ বিদায় নেবার লগ্ন, তামাম দুনিয়ার অত্যাচারিত সর্বহারারা দিকে দিকে জেহাদ ঘোষণা করেছে—বণিকতন্ত্রের প্রচণ্ড শক্তি, সংহতি ও অহমিকা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে সামন্ততন্ত্রের অনুসরণে বিস্মৃতির পরপারে মিলিয়ে যাবে।

নিজের বক্তব্য রাখবার পূর্ব মুহূর্তে রেজি দ্যব্রের চোখের সামনে চকিতে যেন কতকগুলি ছবি ভেসে গেল। বয়স তাঁর মোটে আঠাশ বছর। ধনীর সন্তান। ফরাসী আভিজাত্যের নীল রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত। অথচ ছাত্রজীবন থেকেই মার্কসবাদ তাঁকে আকর্ষণ করে। বিখ্যাত মার্কসবাদী দার্শনিক লুইস্ এলথুসার ছিলেন তাঁর সহপাঠী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইউনিভারসিটির চত্বর পেরিয়ে প্রায়ই তাঁরা দু' জনে ফ্রান্সের শিল্প সমৃদ্ধ শহর বা শহরতলির মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতেন। এ দিকটায় অন্য চেহারা। বাড়িগুলি লম্বা লম্বা, আধুনিকতার ছাপ নেই। চারদিকে ছোট-বড় কারখানা, সাইরেনের ভোঁ বাজছে, যেন জাহাজ ঘাটায় কোন জাহাজ ভেঁপু দিচ্ছে। অদ্ভুত এখানকার পরিবেশ। বসন্ত কখন আসে কখন যায় টের পাওয়া যায় না। কিন্তু শীতটা যেন চিরায়ত। ঘাড় গুঁজে মানুষের দল যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। ওদের বকবকানি প্রলাপের মতো। কেউ হাঁচে,

কেউ কাশে। গোর্কীর 'মাদার'-এর স্বাদ পাওয়া যায়। বাদাম গাছগুলিতে ফুল ফুটতে শুরু করেছে; কিন্তু উত্তুরে বাতাসের দাপটে সেগুলো ঝরেও পড়ছে রাশি রাশি।

সেই পরিবেশে দ্যব্রে মার্কসবাদে দীক্ষা নিলেন। ভাবনার সাথে কর্মতৎপরতাকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। ১৯৬১-এর রৌদ্রদীপ্ত কিউবা তাঁকে ডেকেছিল। লাতিন অ্যামেরিকার স্বর্ণাভ মাটিতে পা দিয়েছিলেন রেজি দ্যব্রে। তাঁর বড় কম বয়সী টাটকা যৌবন বিপ্লবের উত্তাপ থেকে খুশির স্বাদ নিতে থাকে। কিউবার সমাজতন্ত্রী শিক্ষাবিদদের সাথে সাগ্রহে পরিচিত হলেন তিনি। বিস্মিত পুলকে দেখলেন, কিউবা কী ভাবে তার নিরক্ষরতা ঝেটিয়ে বিদায় করছে। এতবড় সুশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড ভাবনার অতীত। সর্বত্র এক নতুন প্রাণস্পন্দন। দ্যব্রে তাঁর আদর্শকে খুঁজে পেলেন যেন।

কিউবা ছেড়ে লাতিন অ্যামেরিকার একাধিক দেশে ইতি উতি ঘুরে বেড়ালেন দ্যব্রে। অশ্বমেধ-ঘোড়ার মতো চক্কর লাগালেন দক্ষিণ অ্যামেরিকার দেশে দেশেও। দৃষ্টি তাঁর সতর্ক ও উজ্জ্বল, সন্ধানী মন খুঁজে বেড়ায় সংগ্রামী মানুষদের, বিপ্লবীদের, গেরিলাদের। অনেক দেশেই বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। অনেক জায়গায় বড় অসময়ে যুদ্ধ শুরু হওয়াতে বিপ্লবীরা বিপর্যস্ত। শেলের টুকরো মুখে লেগে আহত গেরিলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন দ্যব্রে। শুনছেন অনেক বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী, আবার অনেক করুণ ব্যক্তিগত হাহাশ্বাসও তাঁর স্পর্শকাতর মনে ছাপ রেখে যায়। গেরিলাদের সুখ-দুঃখের ওঠা নামা। একজন গেরিলা বন পেরিয়ে পুরনো আবাসে ফিরে এসে দেখলো, তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। তার আত্মীয়-স্বজন পরিজনকে সরকার নির্মমভাবে সরিয়ে ফেলেছেন মাটির বুক থেকে। আর এক সংগ্রামী যোদ্ধা খবর পেলো, তার প্রেমিকা নাকি কোন মার্কিন বৈমানিকের সাথে চলে গেছে।

জীবনের সেই সব তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা নিয়ে রেজি দ্যব্রে কলম ধরলেন। প্রথমে লিখলেন "Le Castrisme : La Longue marche de I' Amerique Latine." ছাপা হলো জা পল সাঁত্রে সম্পাদিত বিখ্যাত কাগজ "Les Temps Modernes"-এ। সাঁত্রে পর্যন্ত চমকে উঠলেন দ্যব্রের চিন্তাশক্তির সাহসিকতায়, বক্তব্যের ঋজুতায় এবং নিপুন রচনা শৈলীতে। বুদ্ধিজীবী মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। দ্যব্রেকে জানবার জন্য সকলেই ব্যাকুল। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন রেজি দ্রব্রে। ১৯৬৫ তে আর একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখলেন : "America Latina : algunos problems de estrategia revolucionaria।" এ লেখাটি নিয়েও আলোচনার ঢেউ উঠলো কম নয়। শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিকদের আসরে রেজি দ্যব্রে নিজের আসন পাকা করে নিলেন।

ফিদেল কাস্ত্রো স্বয়ং দ্র্যব্রের সাথে যোগাযোগ করলেন, তাঁকে অনুরোধ জানালেন হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হতে। '৬৬ তে তাই আবার কিউবাতে ফিরে এলেন দ্যব্রে। ফিদেল তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিউবার বিপ্লবের তত্ত্বগত তাৎপর্যের গবেষণা শুরু করলেন দ্যব্রে, যে গবেষণার আশ্চর্য ফলশ্রুতি : Revolution in the Revolution ?

এই একখানি মাত্র বই রেজি দ্যব্বের খ্যাতিকে য়ুরোপ আর লাতিন অ্যামেরিকা ছাড়িয়ে পৃথিবীর প্রাতটি দেশে পৌছে দিল। মার্কসবাদী সংগ্রামের নতুন ভাষ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেলো এটি। ধনতান্ত্রিক দেশের পত্রিকাগুলিও এর গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারলো না।

প্রখ্যাত সমালোচক গ্রাহাম গ্রীণী বললেন : Deserves to be read by these who do not share Mr. Debray's views !

অ্যামেরিকার বহুল প্রচারিত New York Review of

Books মন্তব্য করলে: His book is of tremendous importance.

জনপ্রিয় Guardian-এ লেখা হলো: The most interesting and relevant piece of Marxist theoretical writing that has appeared for some time.

New York Times কবুল করলে: If anything else, the book should bring home the difficult fact....that Communist belief is neither monolithic nor static.

Ramparts এর অভিমত: Debray's intellectual importance stems from his being one of the few major theorists....to analyse what seems to be becoming the Third World's dominant pattern of social revolution.

সেই রেজি দ্ব্রে এসে দাঁড়িয়েছেন কাঠগড়ায়। সমস্ত রকম মানসিক ক্লান্তি ও উদ্বেগকে এই মুহূর্তে মুক্তি দিয়ে তিনি জ্বলে উঠলেন। তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও জ্বালাময় তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো:

আমার শাস্তি হবে। হবেই। কী কারণে যে শাস্তি হবে, সেটার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এখানে পরিহাসের সামিল। বিচারের নামে এই যে প্রহসন, তার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের খবর কী আপনারা জানেন না? জানেন। নিশ্চয় অনুভব করতে পারছেন। এটা হচ্ছে মার্কিন নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের এক মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন। আমার বিচার ও শাস্তির হুকুমনামা একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

বলিভিয়া তথা লাতিন অ্যামেরিকার দিকে তাকান; দেখবেন এখানে নির্যাতিত জাতিগুলি সাম্যবাদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠে ইয়াঙ্কিদের পদলেহনকারী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে কী প্রচণ্ড সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের দমন করতে ভাড়াটে কুত্তারা স্বৈরিণী

স্পর্দ্ধায় স্ফীত। ইতিহাসের এই বাঁক মুখে যে সচেতন লোক সাম্যবাদী বিপ্লবে বিশ্বাসী হবেন অথবা, এর সামিল হবেন, তাঁর পরিণতি হবে আমারই মতো—স্বৈরাচারীদের কারাগারে পচে মরতে হবে অথবা, এক ঝাঁক বুলেটের দিকে বুক পেতে দিতে হবে।

এটা অস্বাভাবিক নয়। পতন মুহূর্তে বুর্জোয়ারা আরো নির্লজ্জ, পাশব ও অত্যাচারী হয়ে থাকে। তথাকথিত আইন ও নীতিবোধের মুখোশটিও তারা তখন খুলে রাখে। নিজেদেরই সৃষ্ট আইনকে পর্যন্ত তখন আমল দেয় না। ফরিয়াদী উকিল বিচারের রায় শুনে আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন: সংঘর্ষে মারা যাওয়ার চেয়ে ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে দ্যব্রে অনেক সৌভাগ্যবান।

আমি কিন্তু এমন সৌভাগ্যকে মোটেই কামনা করিনি। বরং, এর উল্টোটা আমি চেয়েছিলাম। আমার বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। যেন-তেন-প্রকারেন একটা গুরুতর মামলা দাঁড় করানোই ছিল বলিভিয়ান সরকারের উদ্দেশ্য। আমার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, আমি নাকি একজন গেরিলা নেতা—বলিভিয়ার সম্ভাবনাকে হত্যা করতে এসেছি! মিথ্যে কথা! আপনাদের স্বীকার করতেই হবে, আমি শাস্তি ভোগ করতে চলেছি সম্পূর্ণ আদর্শগত কারণে। যেহেতু আমি মার্কসবাদ লেনিনবাদে বিশ্বাসী, যেহেতু 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' আমারই কলম-মুখ থেকে উৎসারিত হয়েছিল, যেহেতু আমি ফিদেল কাস্ত্রোকে শ্রদ্ধা করি, সেই হেতু আমাকে পঙ্গু করে ফেলা ধনবাদী সরকারের একটা 'নৈতিক দায়িত্ব' মাত্র।

আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাজানো অভিযোগের অন্ত নেই। অভিযোগগুলি তৈরী করেছে ইয়াঙ্কি দূতাবাস আর তা দাখিল করেছেন বলিভিয়ার দালাল সরকার। আমি নাকি দু' দু'বার বলিভিয়ায় এসে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে গেছি! আমি নাকি গুয়েভারাকে প্রচুর টাকা সাহায্য করেছি। আমি নাকি কিউবা থেকে একদল সশস্ত্র

গেরিলাকে বলিভিয়ায় আমদানী ক'রে গুয়েভারার হাতকে আরো সবল করেছি!

অভিযোগগুলি একেবারে মিথ্যা। তবে হাঁ, বলিভিয়ার জঙ্গলে চে'র সাথে আমি দেখা করেছিলাম। তাঁর আদর্শ, তাঁর সংগ্রাম আমাকে মুগ্ধ করেছে। গেরিলারা আমার কোড নাম দিয়েছিল 'দাতন'। এইটুকুই সত্যি। আমি এটা অকপটে স্বীকার করছি!

বলিভিয়ায় শ্রেণীসংগ্রাম দানা বাধছে। কিন্তু বিপ্লব এখনও অনেক দূরে। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তৈরী ক'রে নিতে হবে। আমি তেমন একটা আদর্শে এখনো অবিচল। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে আরো যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে, যেমন, আমি নাকি জঙ্গলে-জঙ্গলে গেরিলাদের নিয়ে পাঠচক্র খুলেছিলাম, আমি নাকি বলিভিয়ায় একাধিক ধ্বংসাত্মক কাজে নেতৃত্ব দিয়েছি এবং এক বিরাট অভিযানের প্রস্তুতি নাকি আমি তৈরী করছিলাম ইত্যাদি, একেবারে আজগুবি, সম্পূর্ণ সাজানো ষড়যন্ত্র। এই সমস্ত জাল অভিযোগের একটিও কি বলিভিয়ান সরকার প্রমাণ করতে পারবেন? সেই সৎ সাহস কি তাঁর আছে? নেই। তাই আমি ধিক্কার দেই। বার বার ধিক্কার জানাই বিচারের নামে এই কাপুরুষতাকে।

আমি যে গুয়েভারার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই ক'রে মৃত্যু বরণ করি নি, এটা আমার দুর্ভাগ্য। সেই দুর্ভাগ্যের জের টানতে এমন এক হাস্যকর বিচার ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হলো আমাকে। আমার জীবনে সেটা ছিল স্বপ্ন, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হলো না। কাজেই আইনের কাছে আমি তো তথাকথিত কোন কৃতকর্মের জন্য দায়ী হতে পারি না। আইন তো কখনো কারুর বাসনার জন্য শাস্তি দেয় না।

লাতিন অ্যামেরিকার প্রতিটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, ইয়াঙ্কিদের পদলেহনকারী প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধান, পেন্টাগণের কোল ঘেঁষা প্রত্যেক রাজনীতিবিদ যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি দাঁড় করাতে। তথাকথিত আইন এখানে নোংরা রাজনীতির সাথে

আপোষ করেছে, রীতিমত লুকোচুরী খেলছে। তাঁরা বলছেন, তুমি এক বিপজ্জনক তত্ত্বের জন্ম দিয়েছো, যে তত্ত্ব দেশে দেশে অশান্তি আর রক্তস্রোত অনিবার্য ক'রে তুলছে। অতএব, তুমি এক গুরুতর অপরাধে অপরাধী।...

আমি যখন বললাম, আমার নীতি অনুযায়ী সংগ্রামী কমরেডদের আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই, দালালরা খুশী হন এবং বলেন: অবশেষে খুনেটা কথার মারপ্যাচে নিজের অপরাধ কবুল করলে! এঁরা দারুন স্বস্তি বোধ করেন, যদি আমি বলতে পারি যে বলিভিয়ার জঙ্গলে সত্যই গেরিলা তৎপরতা চালাচ্ছিলাম। আমি যদি এ ধরণের কথা বলতে পারতাম, তাহলে মোটেই অখুশী হতাম না। কিন্তু আমি যে সত্যনিষ্ঠ! মিথ্যেকে কোনমতেই ফেনিয়ে সত্য বলে চালানো আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। এখানে আমি নিরুপায়। ভদ্রলোকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলাম না।...

একটা কথা সূর্যের মত সত্যি। তা হলো এই যে, আমি একজন বিপ্লবী। আমি মনে করি, বিশ্বের যে কোন জায়গায় বৈপ্লবিক সংগ্রামের সামিল হবার অধিকাব আমার আছে। যদি কোন সংগ্রামী নেতা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে লড়বার জন্য আমাকে আহ্বান জানান, আমি অবশ্যই সেই ডাকে সাড়া দেবো।

আমার সেই বৈপ্লবিক প্রত্যয়ের জন্যই এই বিচারের প্রহসন। এই শাস্তি। আপনারা আমার আদর্শকে হত্যা করতে চান। কিন্তু আদর্শ অম্লান। কোন প্রতিক্রিয়াশীল হাত তাকে কলঙ্কিত করতে পারে না। গত বছর এপ্রিলে চে'র সাথে আমি মিলিত হয়েছিলাম। তখন যদি চে বলতেন, 'তুমি শারীরিক দিক থেকে সক্ষম; আমাদের সংগ্রামে নেমে পড়ো; আমি সানন্দে বন্দুক ধরতাম। আমি পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ করতাম। চে'র অধীনে যুদ্ধ করতে পারা তো মস্ত সৌভাগ্যের কথা! আমার দুর্ভাগ্য, পুষ্টির অভাবে আমি সে সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। গেরিলা যুদ্ধে যে শারীরিক ক্ষমতা দরকার,

আমার তা ছিল না। চে তাই এ বিষয়ে আমার উপর আস্থা রাখতে পারেননি। যদি সেটা সম্ভব হতো, তবে আমাকে এ রকম মেকী বিচারের সম্মুখীন হতে হতো না। এমন জঘণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হতাম না।···

আমি জানি, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বলিভিয়া একদিন মুক্তি পাবে। চে'র সাথে আমার যখন প্রথম সাক্ষাৎ হলো, তখন, পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখনো ইতস্ততঃ আক্রমণ প্রতিআক্রমণ শুরু হয় নি। চে আমাকে সংবাদদাতার ভূমিকা নিতে বলেছিলেন। আরো দুটো-একটি ছোট খাটো কাজের দায়িত্বও ছিল। ঠিক করেছিলাম, পরবর্তী পর্যায়ে আমি গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে যোগ দেবো।

হঠাৎ ঘটনা বাঁক নিলো। বলিভিয়ার গেরিলারা একরকম অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। বাইরের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। চে আমাকে আর বুস্তস্‌কে গুতিয়েরেজ শহরের মধ্য দিয়ে পালাতে বললেন। চিনো আর তানিয়াও স্থানীয় নন। কিন্তু গেরিলা হিসাবে ওঁদের মূল্য অসাধারণ। তাই তাঁরা থেকে গেলেন।

গুতিয়েরেজ থেকে পালাবার পথও একদিন রুদ্ধ হয়ে গেল। আমি তখন চে কে বললাম, আমাকে আপনার সাথে থাকতে দিন।

চে বললেন, দেখছেন না জায়গাটা কি করম জংলা? এখানকার আবহাওয়া আপনার সহ্য হবে না!

সত্যি, গেরিলা হিসাবে আমার মূল্য কানাকড়িও নয়। দশজন শহুরে বুদ্ধিজীবীর চেয়ে একজন স্থানীয় কৃষক অনেক বেশী কার্যকরী হতে পারে এই পরিস্থিতিতে। আমি বুঝলাম, বাইরে থেকে সংগ্রামীদের অন্তর্ভাব সাহায্য করাই উচিত আমার।

আমি ভাবলাম একজন নির্লিপ্ত দর্শকের মতো একদিন যে পথ ধরে এখানে এসে ঢুকেছিলাম, সেই পথ দিয়েই বেরিয়ে যাবো।

চে কিন্তু কখনো আমাকে স্থান ত্যাগের আদেশ দেন নি। আমার সুবিধা-অসুবিধার কথা বুঝিয়ে বলেছিলেন মাত্র। যাওয়া বা থাকা আমার নিজের ইচ্ছারই উপর নির্ভর করছিল।

আমি ভাবতে পারি নি, এ ভাবে ধরা পড়ে যাবো! আর আমাকে নিয়ে এত হৈ চৈ ও বিচারপ্রহসন চলবে। ভেবেছিলাম, তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আবার গুয়েভারার সাথে মিলিত হবো। কিন্তু তা হলো না। এ সব কথা আজ অপ্রয়োজনীয়। তবু বলছি, কারণ, এরা আমার মতো একজন সমর অপটু অসামরিক লোককে একজন বিপ্লবী যোদ্ধা বলে চালাতে চাইছে। সেই কৃতিত্ব তো আমার ছিল না!

…অত্যাচার, অত্যাচার আর অত্যাচার। মেহনতী মানুষের উপর শোষণ ও বর্বর অত্যাচার বলিভিয়ার বৈশিষ্ট্য। আমি অনেক উদাহরণ টানতে পারি। ২৪শে জুনের রাত্রির কথাই ধরুন। খনি শ্রমিকদের রক্তে অন্ধকার রাত লাল হয়ে উঠেছিল। বিনা প্ররোচনায় মাঝরাতে ঘুমন্ত মজুরদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে বলিভিয়ান সৈন্যরা। অনেক কারচুপি ক'রে সরকার তরফ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, তাতেও স্বীকার করা হয়—সাতাশটি প্রাণী খতম, আহতের সংখ্যা এর কয়েকগুণ। সাতাশটি পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেল। কিন্তু ওরা কাঁদতে পারবে না,—কান্না এখানে বেআইনী। রাজপথে কোন রাজনৈতিক বা মানবিক প্রচারপত্র লটকানো নাকি অপরাধ। আমাকে যেমন অভিযুক্ত করা হয়েছে, ঐ সমস্ত জঙ্গী খুনীদের তেমনি কেন এমন আদালতে টেনে আনা হবে না?

আর আপনারা যাঁরা, বিচারকের আসন অলংকৃত ক'রে আছেন, তাঁরাও অপরাধী! অপরাধী এইজন্য যে আপনারা ঐ সব গণহত্যার জন্য কোন বিচারসভা বসান নি, আপনারা আইনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ সমস্ত কাজে কি তবে আপনাদের সমর্থন রয়েছে? তবে তো আপনারাও খাকী পোশাক পরে টমিগান হাতে জনগণের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন!···এই সরকার মানসিক দিক থেকে অসুস্থ। ফ্যাসিস্টদের মতো তাঁরা নিছক হত্যার মাধ্যমেই ইতিহাসে স্থান ক'রে নিতে চান। আমরা এই হিংসা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিছক নীরব অশ্রুপাতে বিশ্বাসী নই। আজ মানুষের কাছে তুটি মাত্র পথ খোলা আছে, তার যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে—জঙ্গী অত্যাচারের পায়ে নিজেকে বিসর্জন দেওয়া অথবা গেরিলা যুদ্ধে অতি নির্মমভাবে সেই অত্যাচারের মোকাবেলা করা। তুটোতেই হিংসা রয়েছে। প্রথমটি দমন করবার জন্য। দ্বিতীয়টি মুক্তির জন্য। আপনারা প্রথমটি বেছে নিন। আমি শেষটাই বরণ ক'রে নেবো।···

আমাকে ত্রিশ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে। এমন শাস্তি একজন হত্যাকারীকে দেওয়া হয়ে থাকে! আমি কাকে খুন করেছি? আমি দেশদ্রোহী নই, খুনীও নই।···

যুদ্ধ অতি নিষ্ঠুর। তবু আমি জানি, বলিভিয়ার জঙ্গলে গেরিলারা নীতিগতভাবে লড়াই চালিয়েছে। তারা মানবিক আবেদনে ভরপুর। কখনো বাতিস্তা বা বারিয়েনতোসের চমূদের মতো মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেয় নি। যতটুকু সামর্থ্য ছিল, তারা আহতদের শুশ্রূষা করেছে। বন্দীদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করেছে। তাদের ওপর কোন রকম পাশবিক অত্যাচার চালায় নি। যতটুকু খাবার তাদের ছিল, বন্দীদের সাথে সমানভাবে ভাগ করে খেয়েছে। রাতে ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষার জন্য বন্দীদের তারা গরম কম্বল দিয়েছে। গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মৃত বা বন্দী সৈনিকদের অনেক ব্যক্তিগত জিনিস নাকি তারা কেড়ে নিয়েছে। হাঁ, নিয়েছে। নিয়েছে ওদের বুট, কারণ জঙ্গলে লড়বার সময় ভালো জুতোর দরকার। বন্দীদের জামাও খুলে নিয়েছে, কারণ গেরিলাদের শরীরে জামা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু অশালীন কিছু করা হয় নি। কখনো

কোন মৃত সৈনিককে বিবস্ত্র করা হয়নি।...গেরিলাদের অনেক বিষয়ে ঘাটতি ছিল। সঙ্গে যথেষ্ট ওষুধপত্র থাকতো না। বিশেষ করে গ্লুকোজ। আর চে'র নির্দেশে আমরা আমাদের সেই সীমাবদ্ধ ভাণ্ডার আহত বন্দীদের চিকিৎসার জন্যই অধিক পরিমাণে ব্যয় করতাম।

আমাদের বিরুদ্ধে আর এক দফা অভিযোগ, আমরা নাকি সুযোগ পেলেই চুরি ও লুটপাট চালাতাম। এ সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে আমি চাই না। আপনারা জানেন, আমরা কি নিতাম। আমরা সুযোগ পেলেই সামরিক বাহিনীর হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা-বারুদ ছিনিয়ে নিতাম। এটাই আমাদের চুরি ও বাটপাড়ি। আমরা কখনো একখণ্ড মাংস, একটা আলু বা এক মুঠো শস্যও ছিনিয়ে নেইনি। কৃষকদের উপযুক্ত দাম দিয়েই গেরিলারা তাদের খাবার সংগ্রহ করতো।...

আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসার পাহাড় তুলেছেন ফরিয়াদী উকিল। আসলতো পেরু-র সংগ্রামী দৃঢ়চেতা মহান গেরিলা যোদ্ধাদের সাথে আমাদের নাকি কোন তুলনাই হয় না। ক্যামারগো ওয়ারনেস, পাদিল্লা, লাঞ্জা ইত্যাদি গেরিলাদের তুলনায় আমরা নাকি অতি নীচু স্তরের। আমরা নাকি গেরিলা নামের অযোগ্য, ভীরুর মতো লড়াই করি, জঙ্গলে লুকিয়ে চোরাগোপ্তা, আক্রমণ শানাতেই অভ্যস্ত। খনি শ্রমিকেরাও আমাদের তুলনায় নাকি সাহসী, ওরা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পিছপাও নয়!

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুক্তিসংগ্রামে গেরিলারা কি জঙ্গলে থেকে তাদের আক্রমণ এর আগে কখনো শানায় নি? গেরিলাযুদ্ধের স্বাভাবিক রীতিই তো তাই। ইনকুইসিভি, করইকো ভাল গ্রাঁদে ইত্যাদি পার্বত্য এলাকায় সংগ্রাম চালাবার সময় গেরিলারা কি আত্মগোপন ক'রে তাদের অতর্কিত আক্রমণ চালায় নি? যুদ্ধের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী উভয় তরফই প্রাকৃতিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়েছে। নিষ্ঠুরতার ভূরি ভূরি নিদর্শন তুলে ধরা যায়। স্পেনীয়রা

পাহাড়ের উপর থেকে তাদের প্রতিপক্ষ লোকদের নীচে ছুঁড়ে ফেলেছে, পাথরের নীচে কবর দিয়েছে অগণন লোককে। সেই সব নজীরকে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন আপনারা?

অবশ্য খনি শ্রমিকদের ফরিয়াদী উকিল কেন প্রশংসা করলেন, তা বুঝতে আমার মোটেই অসুবিধে হচ্ছে না। এই সমস্ত শ্রমিকরা নিরস্ত্র অবস্থাতেই প্রকাশ্যে তাদের দাবী ঘোষণা করে থাকে। জঙ্গীলোকেরা তাই সহজেই ওদের খতম করে দেয় এবং তা নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

বিরোধী পক্ষের উকীলের আরো একটি যুক্তি রয়েছে—আমরা গেরিলা নই, কারণ আমাদের নাকি কোন পতাকা ছিল না। এর জবাবে আমি জানাচ্ছি, পতাকা আমাদের ছিল। কিন্তু চারদিক থেকে বেষ্টিত হওয়ায় বাইরের দুনিয়াকে তা জানাবার সুযোগ আমরা পাই নি। লাতিন অ্যামেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় পতাকা আমাদের হাতে ছিল। সেই পতাকার নাম আর্নেস্ট চে গুয়েভারা! হাঁ, আর্নেস্ট চে গুয়েভারা! বলিভিয়ান বাহিনী এ খবর জানতো। কিন্তু গোপন রেখেছে। বলিভিয়ার মুক্তিকামী মানুষের কাছে এই সত্য প্রকাশে তাঁদের ভয় ছিল। এত সব থাকা সত্বেও আমাদের নাকি পতাকা নেই! আর এক মজার অভিযোগ, বলিভিয়ান গেরিলাদের সাথে আমাদের নাকি কোন সম্পর্ক নেই, যেহেতু আমরা বিদেশী।

সত্যি, আমরা বিদেশী। কিন্তু মুক্তি বাহিনীতে বিদেশীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। অধিকাংশ গেরিলারাই এই বলিভিয়ার সন্তান। দু'চার জন এসেছিলেন পেরু, গুয়েতেমালা, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি দেশ থেকে। কিন্তু ইতিহাস টেনে দেখুন, বলিভিয়াতে এমন ঘটনা নতুন নয়। জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসকে তা ক্ষুণ্ণ করে নি। আমি সাইমন বলিভার, সুক্রি, সান্তাক্রুজ, ইত্যাদির নজীর টানছি না। এমনকি, পেরু, গুয়েতেমালা, চিলি ইত্যাদির দ্বারা বলিভিয়ার পত্তনি

ইতিহাসকেও ব্যাখ্যা করতে বসি নি, তামাম লাতিন অ্যামেরিকার সংখ্যাতীত নজীরও আপনাদের সামনে মেলে ধরছি না। আমি শুধু বলছি গেরিলা সংগ্রামের কথা, যেখানে এরকম দৃষ্টান্তের আদৌ অভাব নেই। পাদিল্লা, ওয়ারনেস, লাঞ্জা—এঁদের কথাই ভাবুন। আমার সামনে একটি বই খোলা রয়েছে। সান্‌ফ্রান্সিসকো ইউনিভারসিটি থেকে প্রকাশিত। নাম, 'আলতো পেরুর জনৈক মুক্তিযোদ্ধার রোজনামচা'। বইটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ১৮২০ সালের কথা, যখন এক পৃথক জাতি ও রাষ্ট্র হিসাবে বলিভিয়া আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই সংগ্রামে এই বইয়ের গেরিলা-লেখক অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতাই এখানে চিত্রিত রয়েছে। যোশ ম্যানুয়েল লাঞ্জার অধীনে উনি যুদ্ধ করেছিলেন। বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন দলের বেশিরভাগ গেরিলারাই ছিলেন উপত্যকা অঞ্চলের মানুষ, অর্থাৎ আদিবাসী অথবা, মেস্তিজো। তা ছাড়া এই দলে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বহু সশস্ত্র আনাড়ী যোদ্ধারও সমাবেশ ঘটেছিল। এরা কি বিদেশী নয়? আলতো পেরু-র অভিযানে বহু বিদেশী অংশ গ্রহণ করেছিল। এমনকি, ইংরেজ ও নিগ্রোরাও ছিল।...

আমি একজন ফরাসী। ফরিয়াদী উকিলকে আর তাঁর দেশ সম্পর্কে কি জ্ঞান দিতে যাবো? কিন্তু ইতিহাস টেনে অনেক কথা বলা হয়েছে বলেই এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যটুকু ব্যাখ্যা করতে হলো। স্পেনের হাত থেকে সেদিন বলিভিয়া তথা লাতিন অ্যামেরিকাকে মুক্ত করতে গিয়ে এ ভাবেই বিভিন্ন জাতি সংগ্রামের তাগিদে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। আজ ইয়াঙ্কি-চক্রান্ত থেকে বলিভিয়াকে মুক্ত করতে সেই সৌভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটেছে। এ একটা বিরাট পরীক্ষা। সাম্যবাদ বলিভিয়ার মাটিতে প্রতিষ্ঠা পাবেই। ধীরে ধীরে বলিভিয়াকে কেন্দ্র ক'রে গোটা মহাদেশে এই বিশ্বাস পরিব্যাপ্ত হবে।

চে বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। তিনি এ সব ভৌগলিক সীমারেখায় বিশ্বাসী নন। বলিভিয়া ও পেরুর মধ্যে যে সীমারেখা টানা হয়েছে; চে কে তা আবদ্ধ রাখতে পারে না। তাঁর আদর্শের কাছে পেরুর মানুষ, আর্জেন্টিনার মানুষ, বলিভিয়ার মানুষ, কিউবার মানুষ—সব এক ও অভিন্ন। তাঁর কাছে যেটা বিরোধ, সেটা হলো আদর্শগত। আদর্শের কারণেই ইয়াঙ্কিরা লাতিন অ্যামেরিকার প্রতিপক্ষ এবং সেই সীমানাকেই চে স্বীকৃতি দিয়েছেন। চে মনে করেন, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, কিউবা, পেরু, ব্রাজিল—সমস্ত দেশের মানুষ একই পরিবারভুক্ত, পরস্পর ভাই ভাই। একই জাতি হিসাবে তারা সংগ্রামে রত। তাদের একই ভাষা, একই ইতিহাস, একই সংস্কৃতি।...তাদের শত্রুও অভিন্ন—সেই শোষক শত্রুর নাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সাইমন বলিভার একদিন উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছিলেন 'দক্ষিণ অ্যামেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষই একই পরিবারভুক্ত যোদ্ধা।'...

চে বলিভার-এর সেই ঐতিহাসিক ওজস্বিতার অধিকারী। তিনি অবশ্য বলিভিয়ার জঙ্গলে লাতিন অ্যামেরিকার প্রতিটি দেশের লোককে জমায়েত করতে পারেন নি। সে সময় তাঁর হাতে ছিল না। কিন্তু তাঁর আদর্শ ছিল তাই। এ আদর্শকে বাস্তবায়িত করা কঠিন, অনেকে একে বায়বীয় অবাস্তব বলে মনে করতে পারেন; কিন্তু আগামী দিনের ইতিহাস বলবে, এটাই সঠিক পথ—সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়ের এটাই সঠিক নিশানা।

আবার আমি উণবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ বীর সাইমন বলিভারের উক্তিকে টানছি। ১৮১৫ সালে জ্যামাইকা থেকে তিনি বলেছিলেন ঃ জাতীয়তাবাদের নোংরামি থেকে লাতিন অ্যামেরিকা মুক্ত।

সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা থেকেই অখণ্ড লাতিন অ্যামেরিকার স্বপ্ন বহুদিন থেকে দানা বাধছে। প্রায় দেড়শ' বছর আগে তা অবশ্য সম্ভব ছিল না। আজ কিন্তু এই আদর্শের যথার্থ রূপায়ন

অসম্ভব বলে মনে হয় না। এই আদর্শের জন্যই চে নিজের জীবন দিলেন।

কিন্তু চে'র এই আত্মদান মিথ্যা হবে না। চে নিরস বালুকাভূমিতে তাঁর বীজ বপন করে যান নি। তিনি এক ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছেন, যাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে বলিভিয়ার প্রাণপুরুষ। যারা উৎকট জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধ্বজাধারী, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁরা কখনো এমন আদর্শের সামিল হতে পারেন না। তাঁরা সেই মেষশাবকের সাথে তুলনীয়, যে নিজের এক্তিয়ারে চারণ-ভূমি রাখবার জন্য অন্যান্য মেষশাবকদের হিংস্র বাঘের মুখে ঠেলে দিয়েছিল, কিন্তু বাঘের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে রুখে দাঁড়ায় নি। হয়তো বাঘের সাথে তার কোন গোপন চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু যদি সে মনে করে রক্তলোলুপ বাঘ তাকে ছেড়ে দেবে, তাহলে মারাত্মক ভুল করবে। রক্তলোভী শোষক জাতির সাথে বন্ধুত্ব পাতানো আহম্মকের কাজ। বলিভিয়াকে সে মনে করবে, তার লোভনীয় খাদ্য। তথা-কথিত উদ্ভট জাতীয়তাবাদের নামে দেশকে যারা এভাবে বিকিয়ে দেয়, ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে তাদের স্থান।....

আমার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ, আমি একজন দুর্ধর্ষ গেরিলা নেতা। জানিনা, এই অভিযোগের স্বপক্ষে প্রতিদিন তাঁরা যে সমস্ত উত্তেজনাপূর্ণ নথি-পত্রাদি দাখিল করছেন, তাঁদের উৎস কোথায়! আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই সরকারী প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে অনেক গাল-গল্প লোককে শোনানো হয়েছে।

দুটি ছবিকে ঘিরে এঁরা অনেক রোমাঞ্চকর তথ্য প্রকাশ করেছেন। দুটি ছবিতেই আমার হাতে বন্দুক। এক জায়গায় আমি একা। অপরটিতে গুটিকয় সঙ্গীসহ। খবরের কাগজে ফলাও করে ছবি দুটি ছাপা হলো; নীচে ক্যাপসান: সশস্ত্র গেরিলা নায়ক রেজি দ্যব্রে।... আমি যখন বেস-ক্যাম্প পাহারা দিতাম অথবা, শিকারে বের হতাম, আমার হাতে বন্দুক থাকতো।

কাগজে কাগজে প্রচার করা হয়েছিল, আমি নাকি ছদ্মবেশে এ-দেশে ঢুকেছিলাম। কিন্তু ফরিয়াদী উকিলের কাছে আমার প্রশ্ন, আমার পাশপোর্ট কি অবৈধ? তারা কি এটা প্রকাশ্যে প্রমাণ করতে পারেন? পাশপোর্টটি যে জাল, কোন সূত্রে তাঁরা তা জাহির করছেন?

সরকারী উকিল গল্প ফেঁদেছেন, আমি নাকি এক অজ্ঞাতনামা ভদ্রলোকের মারফৎ গেরিলাদের সাথে মিলিত হই। ঐ ভদ্রলোক আবার সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহারে পারঙ্গম। কিন্তু এমন আষাঢ়ে গল্পে কি এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে, গেরিলাদের সাথে মিলিত হবার জন্য একজন দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয়েছিল আমার। কারণ গেরিলাদের আস্তানায় যাবার পথ আমার জানা ছিল না। একজন সাংবাদিকের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু তাঁরা একটি সত্যকে বেমালুম চেপে গেছেন; তা হলো এই যে, আমি স্বনামেই এখানকার একটি হোটেলে এসে উঠেছিলাম এবং যথার্থ পরিচয়পত্র নিয়ে চলাফেরা করতাম।

আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, সালে পেরু থেকে বলিভিয়াতে আমার বে-আইনী অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এক্ষেত্রেও কাগজগুলি ঢাক পিটিয়েছে, সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য! কিন্তু আমার পাশপোর্ট? সে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে!

অবশ্য এখানে যুক্তির কথা বলা অহেতুক। এক অভিযোগকে প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা আর একটি তথ্যকে পরিবেশন করবেন। হয়তো বলবেন, এর মার্চে চিলিতে আমি আমার পাশপোর্টটি হারিয়ে ফেলি; তাই পেরু থেকে বিতাড়িত হবার খবরটা চেপে যাচ্ছি।

আসলে আমার পাশপোর্টটি খোয়া যায় '৬৪-এর জানুয়ারীতে দক্ষিণ অ্যামেরিকার ইকুয়েডোরে। এই কারণেই পেরুতে আমার উপস্থিতি বরদাস্ত করা হয় নি। কিন্তু কুইটোর ফরাসী দূতাবাস

থেকে একটি পরিচয়পত্র আমাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই পরিচয় বলিভিয়ান সরকার আর প্রেসের কাছে মূল্যহীন। রোমাঞ্চকর খবর পরিবেশনের পথে এসব বাধাকে তাঁরা অবলীলায় নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

আর এক দফা আক্রমণ—আমার গেরিলা নির্দেশিকা শক্তি মুয়ুপম্পায় সরকার হস্তগত করেছেন। এতে নাকি লেখা আছে, রোমানা আমাকে কয়েকটি মারাত্মক কাজের দায়িত্ব দিয়ে মেক্সিকোতে পাঠাচ্ছিলেন। একেবারে বাজে কথা। আমি ডায়েরী লেখা আরম্ভ করেছি গ্রেপ্তার হবার পর, কয়েদখানায় বসে বসে। এখানে যে নোটবুক এনে হাজির করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভূয়ো।

আমার লেখা 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'-এর বিরুদ্ধে এঁদের দারুণ গাত্রদাহ। কিউবান গেরিলা জোয়াকুইনের ব্যাগ থেকে নাকি একখণ্ড এই বই উদ্ধার করা হয়েছে। জোয়াকুইনকে হত্যা করা হয় দেল এসোতে। গেরিলাদের কাছে নাকি আমার বইটি বাইবেল। জোয়াকুইন হয়তো পড়বার জন্য বইখানা সংগ্রহ করতে পারেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমার রচনা যদি তাঁর মতো মহান বিপ্লবীর কাছে সহায়ক হয়ে উঠতে পারতো, আমার খুশীর অন্ত থাকতো না।

আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ও রকম দু'চারখানা বই প্রত্যেক গেরিলার সাথেই থাকে। কারণ, না পড়ে কোন গেরিলা থাকতে পারে না।

আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস্ সাজাতে এবং অপপ্রচারের ঢাক পেটাতে সি-আই-এ সবচেয়ে বেশী উদ্যোগী হয়েছিল। আমার মানসিক ভারসাম্য খতম করবার জন্য গত দু' মাস ধরে আমার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে।·· সি-আই-এর পা চাটা বলিভিয়ার খুনে অফিসাররা একটিও যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেনি, কিন্তু আমার উপর যখন তখন ঘুসি ও লাথি চালিয়েছে। এতে ওদের দারুন উল্লাস।....সি-আই-এর ছদ্মবেশী গুপ্তচর ডঃ গঞ্জালেশ

* আমাকে হাজারো আবোল তাবোল প্রশ্নে বিব্রত ক'রে রাখবার চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে আবার আশ্বাস দিতেন, বলিভিয়ান সরকার নাকি ন্যায়নিষ্ঠ। আমি যদি কিউবার বিপ্লব ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে নিজের অভিমত পাল্টাই, তবে বলিভিয়ান সরকার নাকি আমাকে রেহাই দেবেন। মজার কথা হলো মিঃ গঞ্জালেশ ওরফে পোর্তোরিকো বলিভিয়ার লোক না হয়েও আমাকে সরকারী তরফের আশ্বাস দিতে পারছেন! কি ভাবে সম্ভব? সম্ভব এই কারণে যে, বলিভিয়ার বর্তমান সরকার মার্কিন ডলারের ক্রীতদাস। আর সি-আই-এ বিশ্বজোড়া সেই ডলারের প্রভুত্ব কায়েম করছে। এদের কাছে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, মানবিক-অমানবিক, বিবেক-সত্তা বলতে কিছুই নেই। শ্বাপদের মতো হিংস্র ও ধূর্ত। নিপীড়িত জনতার প্রতি তাদের গভীর অবজ্ঞা। আমি তার ব্যতিক্রম হবো কি কারণে? আমার ব্যাপারে প্রথম থেকেই আইনের বড় একটা সহায়তা নেওয়া হয়নি, চলেছে নিতান্তই বিচার-প্রহসন। এটা একটা বিশেষ ধরণের প্রচার কৌশল মাত্র। আমি শুধু এর মাধ্যম মাত্র। ··

আমার কাছে যে সব পরিচয়পত্র ও প্রশংসাপত্র ছিল, তা এখানে উপস্থিত করা হয় নি। হয়তো তা ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটন বা অন্য কোথাও পাচার করা হয়েছে। সি-আই-এর পক্ষ থেকে জনৈক কিউবান ভদ্রলোক এক সময় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমার সামনে এসে দাঁড়ান। আমার যাবতীয় কাগজ-পত্র পরীক্ষার পর তিনি বললেন: আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি একজন গেরিলা নেতা নন। তবে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদদাতা ছিলেন। সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। মনে রাখবেন, আপনার ভাগ্য আমাদের হাতে।··· এবার বলুন, কী ধরণের দূত ছিলেন আপনি! কী কী খবরাখবর পাচার করেছিলেন? বলে যান—বলে যান। মনে রাখবেন, আমাদের ক্ষমতা অনেক। আমাকে বোকা বানাতে যাবেন না।

---

* আসল নাম পোর্তো রিকো, পানামায় বাড়ি।

বরং যদি সত্য কথা বলেন, আপনার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রচার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে কোন অপপ্রচারই যেমন আমরা কয়েকদিনের মধ্যে গড়তে পারি, তেমনি খুব তাড়াতাড়ি ভাঙ্গতেও পারি।···হেঁ-হেঁ বুঝতেই পারছেন। আমাদের হাতেই তো সব। প্রেস বলুন, বেতার বলুন, বক্তৃতামঞ্চ বলুন—সব। যখনই বুঝবো আপনি সত্য কথা বলছেন, আমরা ওদের থেমে যেতে বলবো। হাঁ, ওরা থেমে যাবে। আপনার ওপর থেকে চোখ তুলে নেবে। রেজি দ্যব্রের নামে প্রেস আর আজগুবি খবর রটাবে না, বেতার আর কুৎসা প্রচার করবে না, বক্তৃতামঞ্চে উঠে মাননীয় বক্তারা আপনার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলবেন না। আপনাকে আক্রমণ করে রাস্তায় রাস্তায় আর একটি পোস্টারও দেখতে পাবেন না, আপনার বিরুদ্ধে ধিক্কার দিতে দিতে জনতার কোন মিছিল রাজপথে বা গলিপথে চক্কর লাগাবে না।··

কিউবান ভদ্রলোক চমৎকার সোজাসুজি বলে যাচ্ছিলেন। আমার কিন্তু খারাপ লাগছিল না। অন্ততঃ লোকটা সরাসরি সত্যকে নগ্ন ক'রে দেখাবার সাহস রাখেন। আশ্চর্য, একেবারে হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট কারেক্ট বলছেন। লাতিন অ্যামেরিকার অধিকাংশ দেশেই এঁরা এক একজন 'সর্বশক্তির আধার ভগবান'। তাঁরা রাজা-মন্ত্রী গড়েন। আবার রাজা-উজীর মারেন। এঁরা সত্যই নমস্য। ওঁরা তাই নিজেদের ধারণা নিয়েই মশগুল, আমার যে কিছু বলবার আছে, সেটা যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। বেশ বুঝতে পারছি, এঁদের বিশ্বাস করানো যাবে না। অথবা, জেনেও ওঁরা জানতে চাইবেন না। প্রকৃত আদর্শকে বুটের নীচে পিষে তবেই এঁরা এমন জবরদস্ত পোর্টফোলিও নিয়ে দুনিয়ার ইতি উতি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কখনো মনে হবে, তাঁরা বুঝি আমাকে সমীহ-ই করছেন, আবার পরক্ষণে ভুল ভেঙ্গে যাবে—আমার চোখের সামনে যেন কোন এক বিজাতীয় হিংস্র প্রাণীর দুটি চোখ দপ্ দপ্ করে জ্বলছে আর নিভছে।

ভদ্রলোক যখন কথার ঝড় তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন,

আমার জানালার কাছ থেকে অনেক কণ্ঠের হিংস্র চিৎকার ভেসে এলো ঃ রেজি দ্যব্রের মুণ্ডু চাই। গুপ্তচরের চূড়ান্ত শাস্তি জনতার হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক।

বেশ একটা রম্ রম্ রব ঃ রেজি দ্যব্রের মুণ্ডু চাই।

বুঝুন তবে। আমার জানালার কাছে যারা ভিড় ক'রে চিৎকার করছিল, তারা কি জনতা? নাকি কিছু ভাড়াটে শ্লোগান-দেওয়া মানুষ? অনুমান করতে ভুল হয় না। তাকিয়ে দেখলাম, প্রশ্নকর্তা ধারালো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। নাকে রুমাল চেপে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। বড় দুর্গন্ধ! এ রকম অবস্থায় অভিমান বৃথা, দুঃখ করা বৃথা, ধমকের সুরে প্রতিবাদ জানানো বৃথা। আমি সেই কবন্ধ অন্ধকারে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন জবাব নেই। শুধু আমার একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও একটা নিঃশ্বাস মুক্তি পেলো। আমার জানালার নীচে তখনও সেই সব লড়াকু মুরগীদের চিৎকার ভেসে আসছিলো ঃ রে-জি দ্য-ব্রে-র মুণ্ডু চা-ই-ই…। এরা সব মুণ্ডু শিকারী! ফুঃ!....

কিউবান ভদ্রলোক চলে গেলেন।

চক্রবৎ দুনিয়া ঘুরতে লাগলো। আমার বিরুদ্ধে কুৎসা দ্বিগুণ ভাবে স্ফীত হ'য়ে উঠলো। বেশ বোঝা যায়, প্রচারবিদ্ হিসাবে এরা এক একজন গোয়েবলস্। নানা রকম কথার মারপ্যাঁচে বার বার আমার নামটা গুয়েভারার সাথে যোগ ক'রে দেয়। এক একটা অপপ্রচার কানে আসে, আর আমি হিম হয়ে যাই। আমাকে এরা পেয়েছে কি? সোনার পাথরবাটি? নিছক ছাগলাদ্য ঘৃত খেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে এসেছি? ওরা জানাচ্ছে, আমিই নাকি ফাঁস ক'রে দিয়েছি, চে বর্তমানে বলিভিয়ার কোথায় লুকিয়ে আছেন! আসলে মার্চ মাসেই সি-আই-এ মারফৎ তারা বুঝে নিয়েছিল, গুয়েভারা বলিভিয়ায় ঢুকেছেন। বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে এমন পোস্টার মারা হলো যেন কিউবার বিপ্লবে আমার এবং কাস্ত্রোর

অবদান সম্বন্ধে যেন গেরিলা হিসাবে আমার সাথে কাস্ত্রো ও গুয়েভারার কোনো তফাৎ নেই।

হা হতোস্মি! আমাকে এমন অপপ্রচারের ঢক্কা-নিনাদে শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় স্থান দেওয়া হলো! ক্ষোভ নয়, আমার নিজের খুব লজ্জা হচ্ছে। আমি একজন সামান্য সাংবাদিক, কলমপেশা যার জীবিকা! আমি একজন ছাত্র মাত্র! আর ফিদেল কাস্ত্রোর মতো মহান সংগ্রামী নেতা আমার সমপর্যায়ের হয়ে গেলেন? এর চেয়ে হাস্যকর ভাষ্য আর কি হতে পারে?

ওয়াশিংটন আর মিয়ামীর অতি আধুনিক প্রেসগুলিতে আমার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রচারপত্রগুলি ছাপা হয়েছে। হাজারে হাজারে বিলি করা হয়েছে এ দেশে। আমার জীবন ও আদর্শকে যতভাবে বিকৃত করা যায়, তাঁরা তা করেছেন! আমি শৈশব থেকেই চণ্ডনীতিতে বিশ্বাসী—মানুষ খুন করতে আমার নাকি বন্য আনন্দ! আমার যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষা কিউবার মাটিতেই নাকি সম্পন্ন হয়েছে। আমার ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকে তাঁরা একেবারে নাস্যাৎ করে দিয়েছেন।···আরো শুনুন, মানুষকে ফাঁসিতে লটকাবার সময় আমি নাকি আমার খাবারের থালা নিয়ে বসি। আর জঙ্গলে ধরা পড়বার মুহূর্তে আমি নাকি একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছিলাম।

আমাকে নিয়ে ওদের কী ফূর্তি। ওদের চোখগুলো, দাঁতগুলোই শুধু ঝক ঝক করছে। আমি যেন কোন এক অন্ধকার গুহায়, একদল নেকড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওদের সেই হিস্ হিস্ হাসি, এলোপাথাড়ি কিল-চড়-ঘুসি, মাথায় বিষ্ঠা ঢেলে দেবার মতো রাশ রাশ রংদার কেচ্ছা ছড়ানো—আমি শিউরে উঠেছিলাম।

অত্যাচারের একটা সূক্ষ্ম দিকও আছে। এঁরা আমাকে দীর্ঘদিন একটা অন্ধকার চোরকুঠীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আটকে রেখেছেন। সেই ভয়াবহ একাকীত্ব ও নির্জনতা আমার স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি

করেছে। আমাকে জোর করে একদিন কয়েদীদের ডোরাকাটা পোশাক পরানো হলো। এমন নিকৃষ্টস্তরের ইউনিফর্ম, যা বলিভিয়াতে একজন সাধারণ কয়েদীকেও পরতে দেওয়া হয় না! অন্যান্য বন্দীদের গায়ে এ ধরণের পোশাক আমি দেখি নি। দারুণ বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা ও হতাশার অভিব্যক্তি এ ধরণের আচরণ।

সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ওদের প্রচার। আমার গা ঘিন ঘিন করতো। সময় সময় আমার স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়ে পড়ত, দুশ্চিন্তার বিরাট ছায়াটা এসে গ্রাস করতো, আমি কিছু বলতে চাইতাম, কিন্তু পারতাম না; আমার কণ্ঠ রুদ্ধ। এই সব বীরপুরুষের দল আমাকে কখনো আত্মপক্ষ সমর্থনের এতটুকু সুযোগ দেন নি। ওদের দেউলিয়া বেশ্যাবৃত্তির যে কোন জবাব নেই, তা ওরা নিজেরাই বেশ ভাল করে জানতেন। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে আমাকে ঠাট্টা করতেন, ব্যালকনিতে বসে থাকা উর্দিপরা প্রহরী রাইফেল তাক করে থাকতো আমার দিকে, মাঝে মাঝে উল্লাস চিৎকার ভেসে আসতো, কারা যেন পর পর পটকা ফাটাচ্ছেঃ গেরিলারা খতম হয়ে যাচ্ছে!...রে-জি দ্যব্রের মুণ্ডু চাই!...

মুণ্ডু শিকারীর দল আমার সাথে কোন নিরপেক্ষ সৎ মানুষকে দেখা করতে দেয় নি। যে সব সাংবাদিকের দল এখানে আসতেন, তাঁরা আমার বক্তব্যকে নাস্তাৎ করে দেবার দলেরই লোক। আমি কী কোন পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে সমস্ত অপবাদ, সমস্ত অবিচার মাথা পেতে নেবো? এত সব মিথ্যা প্রচার, রংদার কেচ্ছা সহ্য করে যাবো? এখানে সত্য-মিথ্যা একাকার, কেউ তার ধার ধারছে বলেই মনে হয় না, প্রেস-বেতার-বক্তৃতামঞ্চ সমস্তই মিথ্যার বেসাতি নিয়ে বসেছে। হলিউডে তৈরী সি-আই-এ মার্কা ছবির মতো। এদের এই রূপ যে এতটা বীভৎস হতে পারে, ধারণা ছিল না। বিচারের নামে যেন একটা অন্ধ জাগুয়ার আমাকে কামড়ে ধরেছিল।

মিথ্যা। আমার জেহাদী কণ্ঠস্বর ঘোষণা করছে, সব মিথ্যা! আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। সবটাই ষড়যন্ত্র। আন্তর্জাতিক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের অভিপ্রকাশ।…আমাকে ত্রিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। যেহেতু, আমি নাকি গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম।

আমি বলছি, আপনারা ঐ দেয়ালের লেখা পড়বার চেষ্টা করুন। দেখুন, এই আগামী ত্রিশটি বছর কি গেরেলা যুদ্ধ থিতিয়ে বসে থাকবে? বড় পরিতাপের ব্যাপার, আপনাদের হাতে এমন কোন অস্ত্র নেই, যার দ্বারা এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন। উইণ্ডস্ক্রীনটা টেনে নামালেই সূর্যের মুখকে অন্ধকার করে দেওয়া যায় না। আমি জানি, আপনাদের মনের পর্দায় অনেকগুলি ভয়ের ছবি বার বার উঁকি ঝুঁকি মারছে। তাই আপনারা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, আপনারা এমন গোঁয়ারের মতো দাপাদাপি করছেন, এমন করে মেহনতী মানুষের রক্তে স্নান করছেন। জনতার ইজ্জৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেললেই জনতার রুদ্ররোষকে খতম করা যায় না, বরং প্রতিরোধ ও প্রতিআক্রমণ সহস্রগুণে বলীয়ান হয়ে ওঠে। তাই বলছি হুঁশিয়ার! আগামী ত্রিশটি বছরের মধ্যেই আপনারা এর জবাব পেয়ে যাবেন!…

ফরিয়াদীর দাবী, বলিভিয়ার ঘটনার পেছনে কিউবার হাত রয়েছে। কিউবাকে বিচার সভায় টেনে আনতে চাইছেন? আমি কিন্তু বলছি কিউবা এতে নাক গলায় নি। আপনারা বলেছেন লাতিন অ্যামেরিকায় সমস্ত অপরাধীর জন্ম নাকি দেয় কিউবা। আমি কিন্তু জানি এ গৌরব একমাত্র মার্কিন দেশের—যত অপকর্মের সে উৎসস্থল। তারা বাণিজ্যের ও রাজনীতির অছিলায় অপরাধীদের দেশে দেশে রপ্তানি করে থাকে। গুপ্তচরের দল সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাতে থাকে; তাতেও কাজ না হলে সরাসরি জেট বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করে, জনতার বুকের উপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেয়। তারাই তো পানামায় যুদ্ধ জাহাজ-

ভিড়িয়েছিল। গুয়েতেমালা, ডমিনিকান রিপাবলিক, কিউবা ইত্যাদি দেশে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিল।…

সভাপতি মশাই, আমাকে আর অল্প কিছুক্ষণ বলবার সুযোগ দিন। আমি নাকি ফ্রান্স ও কিউবার পাঠানো গুপ্তচর। আমি নাকি এখানে অনেক ভড়কিবাজী দেখিয়েছি। সত্যি যদি আমি তা করতে পারতাম, তবে খুশীই হতাম। নিজের দায়িত্বকে অনেক সম্মানজনক বলে মনে হতো। কিন্তু আসল সত্য যে তা নয়। আমার এখানে আসবার পেছনে হাভানার কোন হাত ছিল না। ফিদেল কাস্ত্রো কখনো আমাকে বলিভিয়ায় ঢুকতে বলেন নি। ফ্রান্স ও মেক্সিকোর প্রেসের প্রতিনিধি হয়ে আমি স্বেচ্ছায় এ দেশে ঢুকেছিলাম।

আপনারা অবশ্য অনেকেই জানেন, আমি হাভানা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছুদিন অধ্যাপনা করেছি। আর কিউবার বিপ্লবী ইতিহাস নিয়ে চর্চাও করেছি। সেই দেশ ও তার বিপ্লবী সন্তানদের প্রতি আমার রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা। কিন্তু তাই বলে আমার ব্যক্তিগত কাজকর্মের জন্য গোটা কিউবা দায়ী হবে কেন? আমি আমার নিজের ইচ্ছা ও বিবেকের অনুশাসনে কাজ করেছি, কোন দেশের নির্দেশে নয়। অবশ্য আমার এই উদ্দেশ্যকে যে দেশ মর্যাদা দেয়, সেই দেশের প্রতি রয়েছে আমার অঢেল শ্রদ্ধা।…

ফরিয়াদী উকিলের অভিযোগে এটাই ফুটে উঠেছে যে, বলিভিয়ার গেরিলারা নাকি কাস্ত্রোর হুকুমের দাস মাত্র। আমি স্বয়ং হাভানা থেকে সেই হুকুম বয়ে এনেছিলাম। তাজ্জব কি বাৎ! ফরিয়াদী উকিল মশাই নিজেও হয়তো খুব ভালোভাবেই জানেন, এ একটা বিরাট মিথ্যা। বলিভিয়ার গেরিলারা বাইরের কোন আদেশে পরিচালিত হতো না। তারা মানতো মাত্র একজনকে—তিনি আর্নেস্ট চে গুয়েভারা। গুয়েভারাই ছিলেন তাদের নেতা। একমেবাদ্বিতীয়ম্ নেতা।

আমার বিরুদ্ধে আপনারা তো অনেক বাছা বাছা অপমানকর মন্তব্য ছেড়েছেন। বলেছেন, ফিদেল কাস্ত্রো নাকি আমার প্রভু। এই উক্তিতে শুধু আমি নই, ফিদেলও অপমানিত হয়েছেন। তিনি আমার বন্ধু। বন্ধুত্ব ও প্রভুত্ব এক নয়। গরীবদের শোষণ করে যিনি পুঁজিপতি হন, তিনিই হলেন 'প্রভু'। বলিভিয়ার মাটিতে পীড়ন ও শোষণের মাধ্যমে এ দেশের জনগণকে বঞ্চিত ক'রে যিনি তাঁর ডলারের ভাণ্ডারকে স্ফীত করেছেন, তিনি এক প্রভু,—নাম যাঁর জনসন, বাস যাঁর হোয়াইট হাউসে, মুখ্য চমূ যার পেন্টাগণ ও সি-আই-এ। এখানে কিউবার প্রসঙ্গ টেনে এনে লাভ নেই। কিউবার অত টাকার জোর নেই। তার যা আছে তা হলো আদর্শ, সংযম এবং আত্মদানের সাহস। এইবার বুঝুন কে প্রভু, আর কে আদর্শ বন্ধু। ফিদেল কাস্ত্রো এবং লিণ্ডলে জনসন।···

এইবার ভাবুন, এই বিচার-প্রহসনে কার জয় সূচিত হলো ?

আপনারা কি জিতেছেন ?

আর চে'র আদর্শ কি খতম হয়ে গেছে ?···

আর্নেস্ট চে গুয়েভারা আজ আর জীবিত নেই। কিন্তু তিনি মৃত নন। তিনি আদৌ পরাজিত নন। তিনি অপরাজেয়। জীবনে বহুবার বহু ঝুঁকি নিয়েও মৃত্যুকে তিনি এড়িয়ে গেছেন। তাঁর আদর্শ ছিল, যেখানেই শোষিত জনতা শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করবে, তিনি তার সামিল হবেন এবং সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই চালাবেন। কোন দেশের গণ্ডী তাঁকে আটকে রাখতে পারবে না।···এ ধরণের মানুষের যেটা প্রাণশক্তি, সেটা চিরদিন অম্লান থাকে এবং দিনে দিনে তা বিস্তারিত হয়। শত্রুরা তাঁকে হত্যা করতে পারে, তাঁকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলতে পারে, কিন্তু তাঁর শক্তিকে হার মানাতে পারবে না।. চে বেঁচে থাকবেন আমাদের

রেজি—৬

মধ্যে। চে বেঁচে থাকবেন আমাদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে, যারা বিপ্লবকে সাবলীল ভঙ্গীতে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি আপনাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি না। কারণ, আমি কোন তাৎক্ষণিক আতঙ্কের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দেই নি। আমার অন্তরে জ্বলছে এক আদর্শের আগুন। অম্লান তার শিখা। সেই আদর্শ চে গুয়েভারার। আমি আগামীর পানে অমেয় প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছি। কোন অশুভ আর অমঙ্গল ভয় সেখানে নেই। আমি অনুভব করতে পারছি, চে বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন আমাদের মধ্যে। বেঁচে থাকবেন আমাদের উত্তরসাধকদের মধ্যে, বিপ্লবকে যারা এগিয়ে নিয়ে যাবে নিশ্চিত সাফল্যের সিংহদরজা খুলে!

আমার কথা এখানেই শেষ।···

রেজি দ্যব্রে থামলেন। কে যেন হঠাৎ কাশতে লাগল। বুঝি কার মুখ দিয়ে রক্ত উঠলো। প্রতিক্রিয়াশীলদের দূষিত রক্ত। প্রহরী আরো কাছে এগিয়ে এলো। হঠাৎ কলিং বেল বাজল। কাঠগড়া থেকে ধীরে ধীরে নেমে এলেন রেজি দ্যব্রে।

প্রহরী বেষ্টিত হয়ে এগিয়ে চলেছেন অন্ধকার শেলের দিকে। বিড় বিড় করতে থাকেন যেন: ত্রিশটা বছর! না অতদিন আমায় অপেক্ষা করতে হবে না। তার আগেই ইতিহাস আমায় মুক্ত করবে। হাঁ, করবে!···

চার

আসুন, আমরা আবার সেই একই লোকের মুখোমুখি হই। এবারের পর্যায়ে এটাই হয়তো আমাদের শেষ সাক্ষাৎকার। বলিভিয়ান শেলে ত্রিশ বছরের সাজা নিয়ে অহল্যা-পাষাণের মতো তাঁর এখন শুধু দিন গুণবার পালা। কিন্তু ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে কিন্তু নিছক হতাশার মাকড়সা-জাল নেই। বরং এক স্বপ্নিল আবেশে তিনি দীপ্ত। ইতিহাস তাঁকে ত্রিশ বছরের অনেক আগেই মুক্ত করবে। এ প্রত্যয় তাঁর আছে। তিনি কয়েদ হলেন কোন অপরাধে? বলিভিয়ান সরকার রায় দিয়েছেন, দ্যব্রে এক ভয়াবহ হিংস্র গেরিলা যোদ্ধা। কিন্তু আসল ব্যাপার তো তা নয়। প্রত্যেক সচেতন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন, দ্যব্রের হাতে বন্দুক থাকার অপরাধে তাঁকে হাজতে পোরা হয় নি। কারণ, তিনি ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ ক'রে একটি সাড়া জাগানো তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, যে তত্ত্বের শক্তি এক হাজার লড়ুয়ে গেরিলার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর। সেই 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'ই তাঁর মূল অপরাধ। জা পল ঠিকই বলেছিলেন:

'Regis Debray has been arrested by the Bolivian authorities, not for having participated in guearilla activities but for having written a book—Revolution in the Revolution ? —Which removes all the brakes from guerrilla activities.'

আমরা যদি এবার দ্যব্রের 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'? নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ তাত্ত্বিক আলোচনায় বসি, নিশ্চয় সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

Le Monde পত্রিকা থেকে।

দ্যব্রে হাভানার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে বসে একজন যথার্থ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কিউবার বিপ্লবের মূল চরিত্রকে আঁকবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সেই গবেষণার ফলশ্রুতি 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' প্রথম প্রকাশের সাথে সাথেই কী প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা। দু'লক্ষ কপি নিঃশেষ হয়ে যেতে বেশী দিন সময় লাগে নি। কিউবায় প্রত্যেকের হাতে হাতে সেই বই। কিউবার বাইরেও তার অসাধারণ কাটতি। যেন বিপ্লবীদের হাতে এক নতুন বাইবেল তুলে দিয়েছেন রেজি দ্যব্রে। কিউবান বিপ্লবের এমন ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কথা, কেউ এর আগে ভাবতেও পারেন নি। দ্যব্রে শুধু ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার বিপ্লব তত্ত্বকে যথাযথ ব্যাখ্যা করেন নি, তিনি নিজে নতুন কিছু বলবারও চেষ্টা করেছেন। এটা শুধু ঘটনার বর্ণনা নয়, এখানে বৈপ্লবিক চিন্তার মধ্যেও যেন বিপ্লব আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিরাট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে গেছে এবং তারপরও আর একটি মস্ত দেশে কিছুটা অন্য বৈপ্লবিক পন্থায় গণমুক্তি ঘটেছে। কিন্তু দ্যব্রে এবং ফিদেল কাস্ত্রো মনে করেন, লাতিন অ্যামেরিকার মুক্তিযুদ্ধ সম্পূর্ণ আলাদা এক তত্ত্বের জন্ম দেবে। এটা হচ্ছে বিপ্লবের তৃতীয় পথ। এই পথ যে অভ্রান্ত, কিউবা প্রাথমিকভাবে তা প্রমাণ করেছে।

কিন্তু তত্ত্ব যদি বিজ্ঞানসিদ্ধ হয়, তবে শুধু তা কেন লাতিন অ্যামেরিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে? দ্যব্রে যদি সঠিক হন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নিশ্চয় তা বাস্তবায়িত হবে। লাতিন অ্যামেরিকার মতো অবস্থা যাদের, দ্যব্রের থিয়োরীকে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে সেই সব দেশে। কিন্তু যে সব দেশের অবস্থা জার শাসিত রাশিয়া, কুয়োমিটাং চীন অথবা, বর্তমান লাতিন অ্যামেরিকার সমপর্যায়ভুক্ত নয়, সেখানে কী বিপ্লবের জন্য আমাদের নতুন এক পথের সন্ধান করতে হবে? যদি তাই হয়, তবে প্রতিটি দেশের বিপ্লবীদের জন্য নতুন ক'রে ভাবতে হবে। দ্যব্রে তাঁদের সামনে এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে

দিয়েছেন। এই চ্যালেঞ্জ আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে লাতিন অ্যামেরিকার প্রতিটি জঙ্গী জমানার কাছে। ইয়াঙ্কি প্রভুও ভাবিত। দ্যব্রের ভূত যদি একবার তার যথার্থতা প্রমাণ করতে পারে, তবে লাতিন অ্যামেরিকা আর পেন্টাগনের অছি এলাকা হয়ে থাকবে না।

দ্যব্রের প্রথম কথাই হলো: অতীতের হাত থেকে বর্তমানের মুক্তি (To free the Present from the Past)। আমরা কখনোই আমাদের বর্তমানের সাথে একেবারে লেগে থাকতে পারি না। ইতিহাস অতি সন্তর্পণে ছদ্মবেশে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝেই অতীতের মুখোশ পরে তার আবির্ভাব ঘটে মঞ্চে। আমরা তখন সেই নাটকের তাৎপর্য ধরতে পারি না। প্রত্যেকবারই পর্দা ওঠে এবং ধারাবাহিকতাকে আমরা খুঁজে পাই না, দিশেহারার মতো হাতড়ে বেড়াই। দোষটা কিন্তু ইতিহাসের নয়। আসলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাব। আমাদের স্মৃতি এবং অতীতের কোন কোন ঘটনা এমন পরস্পর জড়িয়ে পড়ে যে আমরা কিছুতেই সেই জটিলতা থেকে প্রকৃত তাৎপর্যকে খুঁজে বার করতে পারি না। আমরা দেখেছি, অতীত প্রায়ই বর্তমানের উপর খুব বেশি চাপ সৃষ্টি করে থাকে। এমনকি, বর্তমানে যদি কোন বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটতে থাকে, তবু আমরা সেই অতীতেরই দোহাই পাড়তে থাকি।

মূলতঃ লাতিন অ্যামেরিকায় কিউবার বিপ্লব তার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অভিজ্ঞতা ও চিন্তার মাধ্যমে ইতিহাসে সে তার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। তার নীতি ও প্রয়োগ নৈপুণ্যকে আজ কেউ অস্বীকার করতে পারে না।....কিউবান বিপ্লবের যেটা প্রকৃত তাৎপর্য এবং এর শিক্ষা আমরা বেশ কিছুদিন উপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু আজ সেটা নতুন আলোকে আবিষ্কৃত হয়েছে। গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কেও এক নতুন ধারণা জন্মলাভ করেছে।

অন্যান্য বিষয়ের সাথে কিউবা প্রথম থেকেই মনে রেখেছিল, সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত তার মুক্তি অসম্ভব। এই সংগ্রাম শক্তিশালী বুর্জোয়া

রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। এটা ইতিহাসের একটা পুরনো ধারণা এবং বহুবার উচ্চারিত। অতীত থেকে নজীর টেনেই অনেকে বলে থাকেন, গেরিলা যুদ্ধ হলো এক ধরণের গণবিক্ষোভ, কারণ ১৯১৭ তে লেনিন এই কৌশলকে প্রয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে লেনিনের উত্তরসাধক স্তালিন এর কিছু সংস্কারও করেন। কিন্তু সেই সব ফর্মূলা এখন প্রায় বস্তাপচা—বর্তমানের সাথে তারা মোটেই খাপ খায় না! অ্যামেরিকার গেরিলা যুদ্ধ আর এশিয়ার গেরিলা যুদ্ধ এক জিনিস নয়। প্রত্যেক দেশের বা মহাদেশের মোটামুটি একই কারণে মুক্তি যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু অত্যাচার থাকলেই, শোষণ চললেই যে গণবিদ্রোহ দেখা দেবে, এমন কোন কথা নেই। আসল সত্য হলো, এর জন্য দরকার সংগ্রামের পথ নির্ণয় এবং প্রচুর ত্যাগ স্বীকার।

রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাটরা পেট্রোগাদে সহজাত-উৎসাহে প্যারিস কমিউনকে অনুসরণ করতে চেয়েছিল; চীনের কমিউনিস্টরা রুশ অক্টোবর বিপ্লবকে আদর্শ মনে করেছিল; আর অতি সম্প্রতি ভিয়েতনাম তার উত্তর দিকে কিছুটা[১] সোভিয়েত-ধাচের বৈপ্লবিক চিন্তায় কৃষকদের সংগ্রামে জমায়েত করেছে।

কিন্তু আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে প্রাক-যুদ্ধ কাল থেকেই সোভিয়েত-ধরণের সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে এশিয়াকে মুক্ত করতে পারে নি। এটা একটা পুরনো নজীর হয়ে আছে মাত্র। সংগ্রামের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবনায় আমাদের আজ ভাবিত হওয়া উচিত।

অনেকেই লক্ষ্য করতে পারেন যে, চূড়ান্ত সংগ্রামে নামবার আগেও সৌভাগ্যবশতঃ ফিদেল কাস্ত্রো মাও সে-তুং-এর যুদ্ধ

---

* দ্ব্রের এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিতর্কমূলক। আবার কিছুটা পরস্পরবিরোধীও বটে। সোভিয়েত-টাইপের বিপ্লবকে অনুসরণ ক'রে মহাচীন ও উত্তর ভিয়েতনাম কি সংগ্রামে জয়ী হয় নি?—লেখক।

সম্পর্কীয় লেখাগুলি পাঠ করেন নি। সেই জন্যই প্রবহমান ঘটনা এবং নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই যুদ্ধ চালনার জন্য কয়েকটি মূল্যবান ও সঠিক মৌলিক নীতি নির্ধারণে সক্ষম হয়েছিলেন। বিপ্লব এই পথেই সফল হলো এবং কাস্ত্রোর নীতি ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পেলো। এত সব ঘটনা ঘটবার পর কাস্ত্রো সমেত কিউবার অন্যান্য বিপ্লবীরা মাও-এর লেখায় চোখ বুলিয়েছিলেন। * এর জন্য কাস্ত্রোকে তাঁর মত বদলাতে হয় নি। লাতিন অ্যামেরিকার সংগ্রামী মানুষরা যে উৎসাহ নিয়ে একদিন জাপানের বিরুদ্ধে মাও-এর গেরিলা নীতি, গিয়াপের কর্মকৌশল এবং লেনিনের বক্তব্য পড়েছিলেন, সেই উৎসাহ নিয়েই আজ তাঁরা ফিদেল কাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারার রচনাগুলি পাঠ করে থাকেন। এবং তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন,

* এটা হয়তো অনেকেই জানেন যে ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অনুপ্রেরণা লাভ করতেন বিখ্যাত সংগ্রামী মার্তির জীবন থেকে। লেনিন সম্পর্কেও অবশ্য কাস্ত্রোর যথেষ্ট শ্রদ্ধা; বিশেষতঃ লেনিনের লেখা State and Revolution বইখানা তাঁকে দারুণ আকর্ষণ করে, এখানে বর্ণিত প্রতিটি নীতিকে তিনি বার বার উচ্চারণ করেছেন। এই বইতেই লেখা আছে, পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে তার ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার কথা।

কিন্তু কাস্ত্রো তাঁর সামরিক উৎসাহ ও উত্তাপ সংগ্রহ করেছিলেন পাবলো ব্রেউ রচিত “Realengo 18” থেকে, মেক্সিমো গোমেজের সংগ্রামী বর্ণনা থেকে এবং এঙ্গেলস্ রচিত রাস্তার লড়াইয়ের (Street-fighting) বিস্তৃত ব্যাখ্যা থেকে, যার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল প্যারিসের অধিবাসীরা ১৮৭০ সালে। সর্বোপরি, আর্নেস্ট হেমিংওয়ের “For whom The Bell Tolls” উপন্যাসখানি কাস্ত্রোকে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে দারুণ উৎসাহিত করতো। ১৯৫৮ এর সফল সংগ্রামের পরই কাস্ত্রো এবং চে প্রথম মাও সে-তুংয়ের Problems of Strategy in Guerrilla war against Japan বইখানা পড়বার সুযোগ পান। বিস্ময়ে তাঁরা দেখলেন, প্রয়োজনের চাপে পড়ে তাঁদের যা করতে হয়েছে, সেটাই যথাযথ; এর জন্য অপরের থিয়োরীকে প্রয়োগ করতে হয় নি।

সংগ্রামের এই আধুনিক ধারণাটাই যথাযথ। পুরনো তত্ত্বগুলি একদিন নিশ্চয় তাদের যথার্থতা প্রমাণ করেছিল। কিন্তু লাতিন অ্যামেরিকার বিপ্লবী যুদ্ধে ওদের প্রয়োগ করতে যাওয়া মারাত্মক ভুল হবে। কারণ, লাতিন অ্যামেরিকার সংগ্রামী পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে যা প্রযোজ্য, তা সবটাই অভিজ্ঞতা প্রসূত। অপরের তত্ত্বকে এখানে বাস্তবায়িত করতে যাওয়াটা মারাত্মক ভ্রম! কোন রকম পুরনো তত্ত্ব জনতার উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে সংগ্রাম আরো শক্তিহীন হয়ে পড়বে—এগিয়ে যাবার চেয়ে আমরা পিছিয়ে পড়বো।

কিউবার প্রথম গণঅভ্যুত্থান যখন ব্যর্থ হলো, ফিদেল এর কারণ খুঁজতে লাগলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, গেরিলারা তাঁদের যুদ্ধ সম্পর্কে অতিরিক্ত তাত্ত্বিক হয়ে উঠেছিল এবং এই তত্ত্বের বোঝাই তাঁদের ব্যর্থতার কারণ। এটা কেন হলো, বোঝা যায়। ইনতেলেক-চুয়ালরা প্রায়ই শারীরিক দিক থেকে কিছুটা দুর্বল হ'য়ে পড়েন। তা ছাড়া, বন-জঙ্গল ও গ্রামীণ পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। এ সবের চাইতেও মারাত্মক হলো তাঁদের অতিরিক্ত তত্ত্ব-বিলাস। অতীতের কোন তাত্ত্বিক কাচের মধ্য দিয়ে তাঁরা বর্তমানকে দেখে থাকেন এবং বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্যেই তাঁদের জীবন ও কার্যধারা আবদ্ধ হয়ে আছে। অপরের তুলনায় তার সাংগঠনিক ক্ষমতা কম। নতুন কোন পন্থা আবিষ্কারেও তার অক্ষমতা। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই নিয়েই লড়াই করবার মতো তড়িৎ তৎপরতা সে দেখাতে পারেনা। তার ধারণা, সে সব কিছুই শিখে ফেলেছে; তাই নতুন কিছু গ্রহণ করবার উৎসাহেও ভাটা পড়ে। সে বিশেষ অনমনীয় হতে পারে না—পুরনো ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, কিছুতেই অতীত থেকে মুক্তি পেয়ে বর্তমানের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। ··

স্বভাবতঃই এই ভুলের জড়ত্ব গোটা সংগ্রামকে কাহিল ক'রে ফেলে, অনেক সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যায়। খুব বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। আমরা স্পেনের বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখানে আলোচনা করতে পারি। সাইমন বলিভারের জীবনী আমাদের শিক্ষা দেয়, যুদ্ধের রীতি নীতি সম্পর্কে কোন কিছুই চূড়ান্ত নয়, পরিস্থিতিজনিত অভিজ্ঞতার দ্বারা আমাদের নীতি নির্ধারণ করতে হবে। বলিভার আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কী ভাবে ধৈর্য ও সাহসের বলে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করা সম্ভব!

তিনি বার বার ব্যর্থ হয়েছেন, চার বছরের মধ্যে পাঁচবার তাঁকে অ্যামেরিকা ছেড়ে পালাতে হয়; পরাজিত হয়েছেন, নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন, কিন্তু দমে যান নি। পাঁচবারই তিনি নতুন উদ্যমে আক্রমণ শানিয়েছেন এবং বোয়াকার যুদ্ধে প্রথম জয়ের স্বাদ গ্রহণ করেন। প্রতিবারের যুদ্ধেই তাঁর কিছু কিছু নতুন ধারণা জন্মেছে। তিনি বুঝেছেন, অস্ত্রবল এবং সেনাবল কম থাকলেও গতির তীব্রতায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। তাই তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর উপর জোর দিয়েছিলেন বেশি। প্রথম আক্রমণে যে সুবিধাটুকু পাওয়া যায়, তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। শত্রুর জাহাজগুলিকে ধ্বংস করে স্প্যানিয়ার্ডদের তিনি এখানে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেন এবং ক্রমাগত ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে তাদের মৃত্যু-যুদ্ধের (War to death) মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন।...

আজকের দুনিয়ায় ফিদেলের মধ্যে আমরা সেই নেতৃত্বকে দেখেছি —সেই তিতিক্ষা ও সাহসিকতা। তাঁকেও একাধিকবার বিপর্যয়ে পড়তে হয়েছে; কিন্তু তিনি ভেঙ্গে না পড়ে নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। মানকাডার ব্যর্থতা, গ্রাণমার বিপর্যয় এবং ১৯৫৮ সালের আংশিক দুর্যোগ তাঁকে ও তাঁর সংগ্রামী সহযোদ্ধাদের পিছু হটতে বাধ্য করেছিল এবং তাঁরা তখনো সুদিনের প্রত্যাশায় ছিলেন।

জ্যাকাপা এবং ইজাবালের গেরিলারা সংগঠিত হবার আগে গুয়েতেমালায় ক'টি গেরিলা focos* গড়ে উঠেছিল? খুব কম এবং তা অতি দুর্বল। ভেনেজুয়েলায় পরাজয়ের ক'টি নিদর্শন আছে? বিশ্বাসঘাতকতা বা, দল ভাঙ্গা ভাঙ্গির ক'টি উদাহরণ রয়েছে?

তবু গেরিলারা মুছে যায় নি। কোন শক্তি তাদের একেবারে খতম করতে পারে নি। তারা আবার জেগে উঠেছে। এমন শক্তি নিয়ে তারা এর আগে কখনো জেগে ওঠে নি। বোধহয়, এতদিনে প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। বৈপ্লবিক প্রয়াস লাতিন অ্যামেরিকায় এ যাবৎ যতটুকু আঘাত পেয়েছে, তা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ, খুব অল্পদিন হলো এই লড়াই শুরু হয়েছে এবং আগামী দিনগুলিতে তা তীব্রতর হ'য়ে উঠবে। বিপ্লব এখন প্রাথমিক পর্যায়ে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, অনেক ভুল-ভ্রান্তি সত্বেও গেরিলারা শক্তিহীন হয়ে পড়ে নি, নিজেদের ভ্রান্তি তারা শুধরে নিতে পেরেছে। ফিদেলও বলেছেন, এটা এক অবাক কাণ্ড এবং এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় আমরা ইতিহাস-নির্দেশিত পথে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখানে ব্যর্থতার প্রসঙ্গ খুব বেশি টানবো না; দ্রুত প্রস্তুতির অভাবে এবং নতুন সংগ্রামের গোড়াতে কিছু কিছু ভুল থাকতেই তা ঘটেছিল। প্রতিটি বৈপ্লবিক প্রয়াসের শুরুতেই অল্প-বিস্তর ভুল হওয়া আশ্চর্যের নয়। ··

১৯০৫ সালে রুশ দেশের সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে পরাজয়ী মনোবৃত্তি ও হতাশা পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল। তখন জেনেভায় নির্বাসিত লেনিন ও অন্যান্য কয়েকজন সংগ্রামের গলদ দেখিয়ে সোচ্চার হ'য়ে ওঠেন। তাঁরা 'ডুমা'র বিরুদ্ধে কথা বলেন নি; কিন্তু

* Focos শব্দটি স্প্যানিশ; অর্থ, গেরিলারা যেখানে তাদের আক্রমণাত্মক শক্তিকে সংহত করে থাকে। এর কোন ইংরেজী যথাযথ প্রতিশব্দ না থাকায় হুবহু ঐ শব্দটিই এখানে ব্যবহৃত হলো।

বলেছিলেন যে, একটি সংহত শক্তিশালী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে হলে অনেক বেশি সুপরিচালিত সংগ্রামের প্রয়োজন। ··১৯২৭ এর চীনে আমরা দেখতে পাই, পরাজয়ের পর কুয়োমিটাং শাসিত দেশে মাও ও তাঁর অনুগামীরা সংগ্রামের ধারা দ্রুত পাল্টে ফেলেন। তাঁরা আর শ্রমিক-বিক্ষোভের পথ না ধরে গ্রামগুলিতে শক্তি সংহত করতে থাকেন এবং শেষে Long March এর মাধ্যমে বিপ্লবকে সফল করেন। চৈনিক পরিস্থিতিতে এরকম একটা Long March এর সত্যই প্রয়োজনীয়তা ছিল।

১৯৫৩-এ মানকাডা,—ব্যর্থতার পর ফিদেল কিন্তু হতাশার গ্লানিতে ভেঙ্গে পড়েন নি। সশস্ত্র সংগ্রামের পথ থেকেও তিনি সরে আসেন নি। বাতিস্তার বিরুদ্ধে অস্ত্রত্যাগের কথা তাঁর মনে বারেকের জন্যও আসে নি। কিন্তু তিনি তাঁর সংগ্রামের ধারা পরিবর্তন করেছিলেন —ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সঠিক পথের সন্ধান পেলেন। একজন বিপ্লবীর কাছে ব্যর্থতাই হলো যথার্থ পাঠ-গ্রহণের সুযোগ। একটি জয়ের চেয়ে একটি পরাজয় তাঁর তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করে। অভিজ্ঞতার সাথে জ্ঞানের সমন্বয় ঘটায়।

লাতিন অ্যামেরিকায় গত কয়েক বছরের সশস্ত্র সংগ্রামে আমরা যা শিখেছি, এতদিনের বৈপ্লবিক তত্ত্বগুলি সমবেত ভাবে আমাদের তা শেখাতে পারে নি। ··গুয়েভারার উদ্ধৃতি এরই সমর্থনে আমি তুলে ধরলাম :

> "···Has the armed struggle really broken out? Are these its first fruits in Venenzuela, Guatemala, Colombia, Peru, Ecuador? Or are they merely skirmishes, manifestations of a restlessness that has not yet borne fruit? The outcome of today's struggles is not important. As far as the final result is concerned it does

not matter whether one movement or another is temporarily defeated.

What is decisive is the determination to struggle which is maturing daily, the awareness of the need for revolutionary change and the certainty of its possibility."*

আজকের লাতিন অ্যামেরিকা অস্ত্রহীন কোন বিপ্লবে বিশ্বাসী নয়। বিপ্লবের যে কোন পন্থাকে এখানে একটি প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব দিতে হবে: ধনতান্ত্রিক দেশের সরকারকে কি ভাবে উচ্ছেদ করা হবে? আরো প্রাঞ্জল ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, কি ভাবে এই সরকারের মেরুদণ্ড, তাঁর শক্তিশালী বাহিনী, যা সমানে যুক্তরাষ্ট্রের মদৎ পেয়ে আসছে, খতম করা সম্ভব? কিউবার বিপ্লব তার নিকটতম লাতিন অ্যামেরিকার দেশগুলির কাছে এই প্রশ্নের ঐতিহাসিক জবাব দিয়েছে। জবাব দিয়েছে তার ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা বৈপ্লবিক সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে, গ্রামীণ এলাকায় তার গেরিলা তৎপরতার মাধ্যমে, গণবাহিনী গঠনের দৃষ্টান্তে, চলমান যুদ্ধের কায়দায় এবং ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের আদর্শে।...

দ্যব্রের পরবর্তী আলোচনা: সশস্ত্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। তিনি বলেছেন, 'স্ব-নিরাপত্তা আজকের দিনে বিভিন্ন ঘটনার অগ্রগতিতে একটা বাস্তব উপায় হিসাবে প্রাধান্য লাভ করছে। কলম্বিয়ায় কৃষকদের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বলিভিয়াতে শ্রমিকদের অনুরূপ ব্যবস্থা এই মতকে আরো জোরদার করেছে।

* 'La gurere de guerilla'—The Guevara, ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন Monthly Review Press.

কিন্তু আসলে এমন প্রয়াস যে কত করুণ হয়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছে ঐ দুটি দেশই। কলম্বিয়ান বাহিনী কৃষকদের গুঁড়িয়ে দিয়েছে; আর '৬৫তে বলিভিয়ায় স্ব নিরাপত্তায় বিশ্বাসী শ্রমিকরাও প্রচণ্ড মার খেয়েছে সেনাবাহিনীর হাতে।

এই দুটো মর্মান্তিক বিপর্যয় যেন একটা যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করছে এবং আমরা বুঝতে পারছি স্ব-নিরাপত্তার তত্ত্ব এ যুগে অচল। যে কোন বৈপ্লবিক উত্থান যেন এই দৃষ্টান্ত থেকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত শিক্ষা গ্রহণ করে।

···কিন্তু লেনিন স্ব-নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছিলেন। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে মেহনতী জনতার এটা নাকি এক কার্যকরী প্রতিরোধ-ব্যবস্থা।···স্ব-নিরাপত্তা শব্দটি কিন্তু ঠিক যথাযথ নয়। শব্দগত দিক থেকে এটা বোঝাচ্ছে নিষ্ক্রিয়, সাহসহীন, নেতিবাচক আবেদন; কিন্তু এটা সর্বাংশে ঠিক নয়। আসলে, এতটা কাপুরুষতা বড় একটা দেখা যায় না। লেনিনের ফর্মূলা ও মার্কসবাদের ব্যাপক প্রসারের অনেক আগেই য়ুরোপের সর্বহারারা যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম শুরু করেছিল, কে তাকে অস্বীকার করতে পারে?

আমরা কি অস্বীকার করতে পারি কলম্বিয়ার কৃষকদের সেই মরীয়া সংগ্রামকে, যারা সামিল হয়েছিল কলম্বিয়ার তিক্ত ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের, যে গৃহযুদ্ধে এক লক্ষের উপর কৃষক প্রাণ হারিয়েছিল? 'জুনের দিনগুলিতে' (June days) প্যারির শ্রমিকরা যে সৈনিক-সুলভ বীরত্ব ও ত্যাগ দেখিয়েছিল, আমরা কি তাতে চমৎকৃত হই নি? অথবা এই ১৯৫২ সালের কথা, যখন লা পাজের বুকে সমবেত চল্লিশ হাজার খনি শ্রমিক লাতিন অ্যামেরিকায় শ্রমিকবিপ্লবের ধ্বনি তুলেছিল?

স্ব-নিরাপত্তায় তাই সাহসের অভাব নেই। বরং এর ঠিক উল্টো—অবিস্মরণীয় ত্যাগ, চোখ ঝলসানো বীরত্ব ব্যর্থতার গ্রানিট

পাথরের বুকে আছড়ে পড়ে নিজেদের নষ্ট ক'রে ফেলে। এর দ্বারা অনেক কিছুই লাভ করা যায়, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা যায় না। এর চেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়া অনেক ভালো। মার্কসের আবির্ভাবের আগেই সংগ্রামী জনতা এই মতে বিশ্বাসী হয়ে উঠছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষলগ্নে দ্বিতীয় টুপাক অ্যামারুমের নেতৃত্বে পেরুতে রেড ইণ্ডিয়ানরা যে সংগ্রামে নেমেছিল, তাকে এই স্ব-নিরাপত্তার একটি উদাহরণ বলা চলে। ইণ্ডিয়ানরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো,—তারা জেগে উঠলো হাজারে হাজারে, লাখে লাখে—criollo* দের ভিটে ছাড়া করলো, স্প্যানিয়ার্ডদের যেখানেই পেলো খুন করলো, ধনবাদী ব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্র তাদের হাত থেকে একদিন যে জমি কেড়ে নিয়েছিল তারা তা আবার ছিনিয়ে নিলো। এত বড় ঘটনা! কিন্তু একেবারে ব্যর্থ! ইণ্ডিয়ানরা সংগ্রাম করেছিল। বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয়ভাবে, কোন কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েও বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ করেছে। তাদের কম-বেশী কোন নিয়মিত বাহিনী ছিল না, প্রচণ্ড আঘাত হানবার জন্য কোন তড়িৎ-গতি সেনাদল তারা সংগঠিত করে নি। গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ সাফল্যেই বিদ্রোহীরা উল্লসীত; তারা কিন্তু আর রাষ্ট্রশক্তিকে চূড়ান্ত আঘাত হানবার তাগিদে লিমা পর্যন্ত ধেয়ে যেতে রাজি হয় নি। লিমা কিন্তু এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিল। সেখানে সরকার শক্তি সংহত করবার সুযোগ পেলো, সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হল। ফলতঃ খুব সহজেই রেড ইণ্ডিয়ানরা হেরে যায়, তাদের গোটা সংগ্রামটাই মুছে গেল। কলম্বিয়াতেও যে উত্থানটি ব্যর্থ হয়েছিল, তাকেও ঐ স্ব-নিরাপত্তাই বলা চলে।

এক কথায় বলা যায়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ আবিষ্কারের আগে মেহনতী জনতা এখানে-সেখানে বিদ্রোহী হয়ে উঠতো।

* স্প্যানিশ শব্দ। মূল অর্থ, শোষক সামন্ত প্রভু।

বিপ্লবী গেরিলাযুদ্ধ শুরু হবার আগে কৃষকরা মাঝে মাঝে অস্ত্র হাতে নেমে পড়তো। কিন্তু এ ধরণের অভ্যুত্থানের সাথে গেরিলাযুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই; যেমন মার্কসের সাথে সোরেলের কোন তত্ত্বগত সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া বৃথা।...

স্ব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা মনে করে, জনতার সকলকে না নিয়ে কোন সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। এ রকম কোন ইউনিটকে তারা স্বীকৃতি দেয় না। যেমন অনেক সময় যথেষ্ট নিয়মানুবর্তী দৃঢ় সংগঠন তৈরী না করেই 'জনতার রাজনৈতিক দল' গঠনের প্রবণতা দেখা যায়, স্ব-নিরাপত্তাও তেমনি পটু-অপটু সকলের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে এক মস্ত গণ গেরিলাবাহিনী (mass guerrilla force) গঠনের স্বপ্ন দেখে, যাতে শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, এমনকি গৃহপালিত পশুগুলিও এসে সমবেত হবে।

স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ থাকলেই যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা যায় না এবং দৃঢ় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা যায় না, স্বনিরাপত্তা ব্যবস্থাও তেমনি তামাম জনতাকে সংগ্রামে নামিয়ে উদ্দেশ্যের পথে আগুয়ান হতে পারে না।...স্ব-নিরাপত্তা বিদ্রোহকে লালন করে। কিন্তু বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ থাকে নেহাৎ স্থানীয় ভাবে। গোটা দেশ জুড়ে তা বিস্তারিত হয় না। স্ব-নিরাপত্তা তাই আংশিক; কিন্তু বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও প্রসার গোটা দেশকে জুড়ে—যে কোন সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা তাদের আক্রমণ চালাবার প্রস্তুতি নিয়েছে। যা স্থানীয়, তার বিস্তার বেশী দূর সম্ভব নয়। আবার সহজেই তাদের খতম করাও সম্ভব। শত্রুরা সহজে তাদের অবস্থান জানতে পারে, চারধার থেকে আক্রমণ চালিয়ে তাদের মুছে ফেলে। কোন নগর বা বিশেষ এলাকার বিদ্রোহী জনতা যদি ছড়িয়ে পড়তে না পারে, তবে তাদের রণকৌশলও হয় আত্মরক্ষামূলক। তারা নিছক প্রতিপক্ষের আক্রমণের জন্য দিন গুণতে থাকে এবং বার বার আক্রান্ত হওয়ায় এক সময় তাদের প্রতিরোধ-প্রাচীর ধ্বসে

পড়ে। চে এর দুর্বলতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন: It maintains the equilibrium between Oligarchic dictatorship and Popular pressure. সংগ্রামের শ্রেণী-চরিত্র ক্রমশই ম্লান হয়ে আসে, আদর্শ মার খায়।

তবে এ কথা স্মরণীয় যে, সংগ্রামের মূল ভিত্তি গড়তে গিয়ে ভিয়েতনামে ও চীনে এক সময় এ রকম স্ব-নিরাপত্তা বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা এহ বাহ্য! কারণ, ইতিমধ্যে অন্যান্য জায়গায় ভিয়েতমিন্‌রা তাদের প্রচণ্ড মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল, যার প্রবাহে এই সমস্ত অঞ্চলগুলিও সংগ্রামের তাগিদে একই নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে।

গিয়াপের বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে চে আরো বিশদ ব্যাখ্যায় বলেছিলেন:

"Self-defence is nothing more than a small part of a whole, with special characteristics. It is never possible to conceive of a self defence zone as complete in itself, i. e. as a region where the popular forces attempt to defend themselves against enemy attack, while the entire zone beyond remains force of disturbances. In such a case, the 'foco' would be localised, cornered, and defeated, unless there occurred an immediate passage to the first phase of the people's war, in other words, to guerrilla warfare."

কাজেই একটা বিরাট গণযুদ্ধের অংশ না হয়ে উঠতে পারলে এই সব স্ব-নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বেই। এবং তাদের এই বিপর্যয় জনগণের আত্মবিশ্বাসে দারুণ ঘা মারে, অতীতে তাদের সাফল্য ও ত্যাগের কোন মূল্যই থাকে না, মানুষ তাদের ভুলে যায়।...

এখন পর্যালোচনা করা যাক, সংগ্রামের বাস্তব রূপ কি হওয়া উচিত ?

কিউবা এবং লাতিন অ্যামেরিকার বিভিন্ন দেশের প্রবহমান ইতিহাস থেকে আমরা বুঝতে পারি, গেরিলা-সংগ্রাম বিশেষ কতকগুলি স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

প্রথমতঃ, প্রস্তুতি পর্ব—গেরিলারা তখন নিজেদের গড়ে তুলেছে ;

দ্বিতীয়তঃ, কার্যকরী মুহূর্তগুলি—যখন শত্রুরা তাদের উপর সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে (আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার চলেছে, ছত্রী বাহিনী নামানো হচ্ছে গেরিলাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য, নির্বিচারে বোমা-বর্ষণ চলেছে)।

তৃতীয়তঃ, চূড়ান্ত বৈপ্লবিক পর্যায়—যখন গেরিলারা অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে এগিয়ে চলেছে, রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই বুর্জোয়াশক্তি বিপন্ন।

প্রস্তুতি পর্বের অসুবিধে অনেক। রাষ্ট্রশক্তি প্রচণ্ড শক্তিশালী—তাদের সতর্ক ও হিংস্র দৃষ্টি পরিব্যাপ্ত। নির্যাতিত জনতাকে গেরিলা যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট করা যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ। তারপর সেই সব অপটুদের শিক্ষা দেওয়া, কষ্টসহিষ্ণু করে তোলা, রাজনৈতিক চিন্তায় পরিপক্কতা আনা—সমস্তই নিপুণতার সাথে করতে হবে। তথাকথিত পারিবারিক ও সামাজিক স্বস্তিতে গা বাঁচিয়ে চলবার মনোভাব কেউ সহজে ছাড়তে চায় না। অনিশ্চিত, রক্তাক্ত ভবিষ্যতের দিকে তাদের সংগ্রামী চেতনাকে উদ্দীপ্ত করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু এই গুলিকে অতিক্রম করতে পারলে প্রতিটি গেরিলা মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে অনমনীয় ব্যক্তিত্ব হ'য়ে উঠবে—তারা দুর্দ্ধর্ষ, তারা ভয়হীন, তারা অতিমাত্রায় ক্ষিপ্র, তারা আদর্শবান এবং মানবিক আবেদনে ভরপুর। তাদের মধ্যে একটি দল কারিগরী দক্ষতাও অর্জন করবে, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে যাদের গুরুত্ব কম নয়।..

কিউবার মধ্য দিয়ে আমরা এই গেরিলা যুদ্ধের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। কিন্তু বলিভিয়া? বলিভিয়ার প্রসঙ্গ এলেই দৃষ্টি আমাদের আটকে যায় ১৯৫২ সালের দিকে। বলিভিয়ার টিন খনিগুলি সেবার অতিমাত্রায় উত্তপ্ত। একটা মস্ত করুণ ঘটনার পূর্বাভাষ। ছাব্বিশ হাজার খনি-শ্রমিক সংঘবদ্ধ। এতদিনের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিব্যক্তিতে তারা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাড়ে নয় মাইল দৈর্ঘ্যে এবং ছয় মাইল প্রস্থে বিস্তারিত শিল্পাঞ্চলে তাদের ক্রুদ্ধ জমায়েত। 'সিগলো ভিন্ট' 'হানুনি' এবং 'ক্যাটভি'র টিনখনির শ্রমিকরা অস্ত্র ধরেছে। মার মার শব্দে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো স্থানীয় মিলিটারী ও পুলিশ ব্যারাকের ওপর। অলিগার্কিক আর্মির এতদিনের বলদর্পী অহমিকাকে তারা মুছে ফেললে—ভয়াবহ গণআক্রমণে রাতারাতি শোষণতন্ত্র খতম। মুক্তি বাহিনী তাদের মুক্তাঞ্চলে নিজেদের সরকার গঠন করলো। কিন্তু সেই বিপ্লব ক্রমশঃ তার চরিত্র পাল্টাতে লাগলো—বিপ্লবের ওপর বুর্জোয়া মরচে জমতে থাকে। শ্রমিকরা তাদের শ্রেণী সচেতনতা ভুলে গেল। বুর্জোয়া মানসিকতায় কাহিল হয়ে পড়লো তারা। অথচ, ওরা সবই পেয়েছিল—ওরা হাতে পেয়েছিল অস্ত্র, দখল করেছিল বেতার কেন্দ্র, শক্তিশালী সংগঠন তাদের ছিল,....গোটা দেশের যেটা মূল সম্পদ, সেই বলিভিয়ান টিন * তাদের কব্জায় চলে এসেছিল। কিন্তু সব পেয়েও তারা কিছুই ধরে রাখতে পারে নি। জাতীয় বুর্জোয়াদের পায়ে নিজেদের সমর্পণ করেছে। আবার ধীরে ধীরে বুর্জোয়ারা সেনাবাহিনীতে নিজেদের প্রভাব কায়েম করেছে, শ্রমিকরা নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে। তারপর সময় ও সুযোগ বুঝে মার্কিন

* বলিভিয়ান কোটিপতিরা টিনকেই মূলধন করে তাঁদের পুঁজির অস্বাভাবিক স্ফীতি ঘটিয়েছেন। তাঁদের পুঁজি যত বাড়ে, খনি-শ্রমিকরা ততই হতাশার অন্ধকারে তলিয়ে যায়। এই টিনকে তাই বলিভিয়ার সাধারণ মানুষ নাম দিয়েছে "the devil's metal."

সরকার অনুপ্রবেশ করেছে। শ্রমিকদের একতায় ইতিমধ্যেই ফাটল ধরেছিল, এবার তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। Military Junta তাদের একটা বড় অংশকে প্ররোচিত করলো,—তাদেরই পুরণো নেতা লাচিনকে কয়েদখানায় ছুঁড়ে দেওয়া হলো। '৬৫ এর মে মাসে ট্রটস্কি পন্থীরা অনির্দিষ্ট কাল ধরে ধর্মঘটের ডাক দিলেন। তারা তখন অস্ত্র ধরতে ভুলে গেছে, সর্বগ্রাসী লোভ ও মোহ মজ্জায় মজ্জায়। শুরু হলো বুর্জোয়াদের আক্রমণ। সামরিক চণ্ড অত্যাচার। খনিগুলিকে চার ধার থেকে মার্কিনী অর্থপুষ্ট বাহিনী ঘিরে ফেললো, আকাশ থেকে নামতে লাগলো অসংখ্য ছত্রী বাহিনী। শ্রমিকদের ব্যারাকগুলির ওপর শেল ফাটতে লাগলো। আকাশ পানে উঠছে গল গল করে ধোঁয়া, মানুষের অন্তিম আর্তনাদে কান পাতা দায়। লা পাজের কাছে খনি শ্রমিকদের উপর বোমা বৃষ্টি করা হলো। মেশিন গানের অজস্র বুলেটে প্রাণহীন জনতা লুটিয়ে পড়লো যত্রতত্র। ওরা নিরস্ত্র—চিৎকার করবার সময় পর্যন্ত পায়নি। পালাবার পথ রুদ্ধ—জতু-গৃহে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ ভয়াবহ আকুলতায় দিশেহারা।

ফলাফল? নিছক হত্যা, ধ্বংস, ধর্ষণ,....হতাশা! প্রত্যেক শ্রমিক নেতার বাড়ি আক্রান্ত হলো। তাঁদের সার সার দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হলো। যারা অপেক্ষাকৃত কমজোরী, তাঁদের ঠেলে পাঠানো হলো কুখ্যাত সব কয়েদখানায়, সূর্যের আলোও যেখানে চুইয়ে চুইয়ে নামে না। তাঁদের বাড়ির মেয়েরা তখন সরবী সৈন্যদের ব্যারাকে সাকীতে পরিণত হয়েছে। হৈ হুল্লোর, পাশবিক মাতোয়ারা।....

ধনবাদী ডলার-প্রেমিক সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সব কিছুই তাঁদের আয়ত্বে। এমনকি, সর্বহারা মানুষের অগ্নিক্ষরা শত্রুও তাঁদের নিয়ন্ত্রনাধীন। মুখে তাঁদের অমৃত বাণী। চলবে এমন বেশ কিছুদিন—পরবর্তী পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত!

যদি লা পাস সমেত বিভিন্ন এলাকার খনিগুলিতেও সেদিন

বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তো, যদি বলিভিয়ার গ্রামগুলিও সে-দিনের সেই সংগ্রামের সামিল হতো, যদি বিপ্লবের লেলিহান শিখায় তারা একই আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো, তা হলে হয়তো অবস্থা ভিন্নতর হতো।....তবে ১৯৫২ তে মার্কিন অর্থপুষ্টের দল যা করতে পেরেছিল, ১৯৬৬ তে তারা তা করতে পারবে না।

আজকের দিনে শ্রমিকদের সম্ভাব্য আত্মরক্ষা ও জয়সূচক আক্রমণের শর্তগুলি কি কি?....'মিলিসিয়ানস্' (Milicianos) হলো বলিভিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত খনি-শ্রমিকদের নাম। যদি তারা ধর্মঘট করে, কিংবা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, সরকার সংযোগরক্ষাকারী পথ ঘাট বন্ধ করে দেবেন, খাদ্য সরবরাহ বানচাল করে দেবেন—লা পাজের মধ্য দিয়ে কোন ট্রেন বা ট্রাক রসদ নিয়ে শ্রমিকদের সেই এলাকায় ঢুকতে পারবে না। আর শ্রমিকরা যেখানে বাস করে, সেই সমুদ্র থেকে প্রায় বারো হাজার ফিট উঁচু বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে একদানা শস্যও যে উৎপন্ন হয় না। স্থানীয় অধিবাসীরা সামান্য পরিমাণে আলু ও সিঙ্কোনা উৎপাদন করে থাকে মাত্র। লামার মাংস ছাড়া আর কোন খাদ্যই লভ্য নয়। এ রকম বন্ধুর এলাকায় দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকলে সর্বনাশ। কাজেই কমরেডরা চাইবেন, দ্রুত বিজয়। হয়তো দশ দিনের মতো খাবার ও জল তাঁদের মজুত রয়েছে। তাই ঐ দশদিনের মধ্যেই তাঁদের মুক্তি লাভ করতে হবে, শত্রুর ব্যূহকে ভাঙ্গতে হবে। তা না পারলে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে,—শিশুদের জন্য আর দুধ যোগাড় করা যাবে না, হাসপাতালে ওষুধ পথ্যাদির দারুন ঘাটতি দেখা দেবে, কসাইখানায় আর মাংস পাওয়া যাবে না। একমাত্র খনি শ্রমিকরা রেল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে মালগাড়িগুলি আটকে দরকারী জিনিসগুলি যোগার ক'রে নিতে পারে। কিন্তু এর তো কোন নিশ্চয়তা নেই। এটা এক অসম যুদ্ধ। বিপর্যয় অনিবার্য।

আর প্রতিপক্ষ সরকারের কি না আছে? তাঁদের ব্যাঙ্কে রয়েছে টাকা, রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঢালাও ঋণ, খাবার বোঝাই বড় বড় গুদাম ঘর সাজানো আছে, বন্দরগুলি মারফৎ মিত্র দেশগুলির কাছ থেকে নতুন নতুন সাহায্য তো আসতেই থাকবে।

বিদ্রোহী শ্রমিকের বিরুদ্ধে তাঁরা তাঁদের মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। হাতে ও ভাতে মারছেন ওদের। শ্রমিক পিতার সামনে তাঁর সন্তান অনাহারে শুকিয়ে যাচ্ছে; সহকর্মী ও সহমর্মীর দল দিন দিন আয়ুহীন—হীনবল দিন দিন; ওষুধপত্রের অভাবে সামান্য রোগই ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়—সামান্য কফের সীরাপটুকুও আর যোগান দিতে পারে না।....

খনিগুলি এক একটা শহরের মতো মস্ত, কোন জানালা নেই—দূর থেকে দেখা যায় তাদের ধূসর রঙ। শ্রমিকদের বস্তি থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বস্তিতে রয়েছে মজুররা ও তাদের পরিবারবর্গ। প্রতিদিন তারা ঐ খনিতে যায় এবং কাজ করে। এখানে মাটি রূক্ষ—এতটুকু পেলবতার ছোঁয়া নেই, সবুজের হাতছানি নেই। যতদূর নজর যায় লাল মাটির এমন বন্ধ্যাদশা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ব্যারাকে শ্রমিকদের কোয়ার্টারগুলি গায়ে গা লাগানো। উপর থেকে খুব সহজেই তাক ক'রে ক'রে বোমা ছোঁড়া যায়। বোমাবাজিতে উৎপাদন ধ্বংস হয় না, ধ্বংস হয় উৎপাদনের মানুষ। খনিগুলি তো মাটির নীচে—মাটির উপরে বোমা ফাটলে তাদের তেমন ক্ষয় ক্ষতি হবার কথা নয়। দুর্বলতার আরো একটি দিক আছে: একটি খনি অঞ্চল থেকে আর একটি খনি অঞ্চলের দূরত্ব কম করেও দশ থেকে কুড়ি মাইল। সৈন্যরা এই মস্ত মস্ত ফাঁকগুলির সুযোগ নেবেই—তারা একটা খনির সাথে আর একটা খনির সমস্ত যোগাযোগ নষ্ট করে দেবে। শ্রমিকরা সেখানে সমবেত হবার পথ খুঁজে পায় না। পরিকল্পনার অভাব, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের শূন্যতা, যুদ্ধ শিক্ষার অব্যবস্থা, পারস্পরিক মত বিনিময়ের নিরুপায়

পরিস্থিতি— যোগাযোগের সব কয়টি পথ হারিয়ে এরা দারুন বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। একমাত্র রাতের অন্ধকারে তারা সামান্য চলাফেরা করতে পারে। অনেকে অবশ্য দিনের বেলাতেই সাহসে বুক বেঁধে নিকটবর্তী শহরে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে দারুণ ঝুঁকি—যে-কোন মুহূর্তে শত্রুর মেশিনগান তার বুক লক্ষ্য করে গর্জে উঠতে পারে।....এরকম অসহনীয় অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে তাদের অবশ্যই অবরোধ ভাঙ্গতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? প্রস্তুতি ছাড়া এমন চেষ্টা আত্মহত্যার সামিল; একটা অগ্নিস্রাবী মেশিনগানের কাছে হাতে ছোঁড়া ডিনামাইট তুচ্ছ। বুলেটের ভাণ্ডারও তো এক সময় ফুরিয়ে আসবে। মাথার ওপর চক্কর খাবে শত্রুর জঙ্গী জেট; আত্মরক্ষার কি উপায়? একটা সেনাদলকে খতম করবার জন্য আর একটা সেনাদলেরই দরকার। আর সেই বাহিনী গড়ে ওঠে নিয়মিত তালিম, নিয়মানুবর্তিতা এবং অস্ত্রের সরবরাহের মধ্য দিয়ে। শুধু একতা আর সাহস নিয়ে একটি বাহিনীকে গড়ে তোলা যায় না। স্পেন এবং প্যারির কমিউন আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে।....সামরিক সংগঠনহীন শ্রমিকরা তাদের ক্ষুধার্ত আত্মিয়-পরিজনদের নিয়ে শত্রু পক্ষের ব্যূহ তচনছ করে একটি চলমান যুদ্ধের রূপ দিতে পারে না। ফলতঃ ওরা তখন নিশ্চিত বলির কাঠগড়ায় গিয়ে মাথা পেতে দেয়। তাদের নিয়তি হয়ে দেখা দেয় শত্রুর বিশাল নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী। নিজেদের খুশী ও ইচ্ছা মতো সেই বাহিনী শ্রমিকদের ব্যারাকে ঢুকে নির্বিচারে হত্যা চালিয়ে যায়। অসহায় মানুষের মৃত্যু নিয়ে এক বিচিত্র খেলায় তারা মেতে ওঠে।...

এই ট্রটস্কি ধাচের সংগ্রাম ও প্রস্তুতি আজ আবার পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এরা মার খাচ্ছে, তবু নীতি পাল্টাতে রাজি নয়—ক্ষমতা দখলের এটাই নাকি সঠিক পথ। এদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সারাংশ হলো:

The worker and peasant masses everywhere crave Socialism, but they don't yet know it because they are still in the power of the Stalinist bureaucracies. Hence the Latent spontaneity of the workers must be awakened. For the attainment of this goal the guerrilla movement is not the highest form of revolutionary struggle···ইত্যাদি।

গেরিলাদের বৈপ্লবিক ভূমিকাকে এক রকম নস্যাৎ করা হয়েছে। তা হোক, তবু আমরা এই ট্রটস্কিপন্থা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবো; দেখবো, সত্যি এর কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে! প্রথমেই আমাদের কিছুটা বিভ্রান্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

প্রথমতঃ এখানে কৃষকদের ওপর কারখানার মজুরদেন মতো সংগঠন এবং প্রলেতারিয়েত ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিয়ম-কানুন চাপিয়ে দেবার কথা বলা হচ্ছে। এর কি অর্থ? সংগ্রামীদের মধ্যে এক বিরাট অংশের প্রতি এটা কি অহেতুক অবিবেচনা নয়? এ ধরণের তত্ত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি ফেনিয়ে উঠবেই। আমরা অবশ্য একটা জিনিস পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি: এই সুন্দর মৌখিক বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে আমরা সত্যিই এক ফাঁদের সন্ধান পেলাম। এই ফাঁদ কখনো কৃষকদের সামনে মেলে ধরা হচ্ছে; কখনো বা বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে সংগঠকদের ওপর! প্রকাশ্যে সংগ্রামীদের নিয়ে সভা করলে সহজেই পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর লোকেরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এটা তাদের জেলখানা বা কবরে ঠেলে দেবার নীতি মাত্র। ট্রটস্কিপন্থীদের এই মারাত্মক নীতির ফলশ্রুতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গুয়েতেমালার জনৈক গেরিলা লিখেছিলেন:

The slogan calling for occupation of the land

and factories, which could be helpful at certain stages of the struggle, provokes, when used anarchically, massacres and tremendous setbacks for the peasants and workers who do not yet have the strength to sustain these invasions.

The famous 'dispute' with the bourgeoisie over the ownership of the means of production is inconceivable so long as the ruling classes control the whole apparat of repression. This tactic could be applied in zones where the development of guerrilla forces, or of the popular army, had proceeded to the point of being able to hold the wave of repression in check. Under other circumstances, it exposes the people's most vulnerable targets to the enemy's blows. Such actions can acquire the character of real provocations, causing defeats that oblige the people to retreat politically as the only way of protecting themselves against repression.

গেরিলা বা গণমুক্তি বাহিনী যতদিন না শক্তিশালী হয়ে উঠছে, ততদিন ট্রটস্কিবাদীদের এমনভাবে কলকারখানা দখল করে নেবার নীতি মোটেই কার্যকরী হতে পারে না। এর ফলে মেহনতী জনতার ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার নেমে আসবে, প্রকৃত সংগ্রাম যাবে পিছিয়ে। চিন্তানায়ক জঁ। পল সার্ত্রেও তাঁর 'Les Communistes et la paix' নিবন্ধে ট্রটস্কিবাদীদের এই হঠকারিতার নিন্দা করেছেন। ট্রটস্কির একটি মধ্যযুগীয় অধিবিদ্যা। এর কাজ করার পদ্ধতির মধ্যেও

রয়েছে একটা একঘেয়ে ভাব। সব দেশের ক্ষেত্রেই তাঁরা একই দাওয়াই বাতলে থাকেন—পেরুর বেলাতে যা, বেলজিয়ামের বেলাতেও তাই। ট্রটস্কিইজম্ ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা নেয় না। তাঁদের ধারণা, তাঁদের হাতে চাবিকাঠি চলে এসেছে। চাবিকাঠি হলো প্রলেতারিয়েতরা। সমস্ত প্রলেতারিয়েতরা, যারা আদৌ সংগঠিত নয়, রাজনৈতিক চিন্তা যারা এখনো পায়নি, ট্রটস্কিবাদীরা তাদের বিপ্লবের নামে কামান-বন্দুকের মুখে হঠাৎ ঠেলে দিতে চান।··· কেউ কখনো কোন ট্রটস্কিপন্থীর কলম থেকে কোন বিশেষ ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য বর্ণনা এ যাবৎ প্রত্যক্ষ করেছেন? বর্তমানের মধ্যে বাস করেও অতীতের বিচিত্র ধারণাগুলিকে লালন করায় ট্রটস্কিপন্থীরা যেন আঙ্গুরের মধ্যে থেকেও ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছেন। পরাজয় ছাড়া তাঁদের কপালে কি কখনো আর কিছু জুটেছে? বিপ্লবের খুনীরা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। গেরিলাদের ওপর বিশ্বাসহীন এই ট্রটস্কিবাদীরা বিপ্লবকে কিন্তু সেই খুনীদের সামনেই ঠেলে দিচ্ছেন। কোন মুক্তিযুদ্ধ দানা বাধলে, তাঁরা কিন্তু এতে যথার্থ অংশ গ্রহণ করেন না; কিন্তু যদি ঐ আন্দোলনে কোন অন্তর্নিহিত দুর্বলতার সন্ধান পান, তবে দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে নেতৃত্ব দখল করেন। তারপর সেই বিচিত্র স্বতঃস্ফূর্ততা, যা কখনোই সংগ্রামী মানুষদের নিজস্ব চিন্তা নয়, এটা একটা চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার মাত্র। সত্যি, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। খেয়াল করে দেখবেন, ট্রটস্কিবাদকে সব সময়ই বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। যদি এটা গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে তাঁরা অনেক সময় জোর করেই তাঁদের তত্ত্ব চালিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি, গোরিলা পদ্ধতির বিরুদ্ধে দুটো শক্তি বেশ সোচ্চার—স্ব-নিরাপত্তায় বিশ্বাসী সংশোধনবাদীরা এবং ট্রটস্কিবাদীরা যাকে গণ-উত্থান বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন, সেটা স্ব-নিরাপত্তার কাছাকাছি।

এই চমৎকার তাত্ত্বিকরা মানুষকে উত্তেজিত করেন আত্মহত্যার ফাঁদে পা ফেলতে। তথাকথিত গৌরবের নামে অর্থহীন মৃত্যুকে তাঁরা টেনে নামান। স্ব-নিরাপত্তা এবং ট্রটস্কিবাদের সমর্থকরা ভাবেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলি হলো সংগঠনের মূলভিত্তি এবং শ্রেণী-সংগ্রামের মূর্ত প্রকাশ। ট্রটস্কিবাদীদের বলা হয়েছে অতি বাম। কিন্তু এই অতি বামের দলই সংশোধনবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে গেরিলাযোদ্ধাদের খতম করবার তালে থাকেন, সম্ভব হলে নিজেরাই গেরিলাদের রক্তে হাত লাল করেন। এটা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে, লাতিন অ্যামেরিকায় এই দুই ধরণের বামপন্থীরা কিউবার বিপ্লবের বিরুদ্ধে চোখা চোখা বিশেষণ ছুঁড়ে মারছেন! পৃথিবীর আর সব জায়গাতেও তাঁরা এই আক্রমণের ধারা বজায় রেখেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই, ভেনেজুয়েলার এবং গুয়েতেমালার নব গঠিত গেরিলাদের* কার্যতঃ দুটো শিবিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হচ্ছে।

আমরা তা হলে ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে কি শিক্ষালাভ করছি? বিপ্লবী গেরিলারা প্রথমেই প্রকাশ্যে আত্মঘোষণা করে না। তাঁদের উৎপত্তি ও প্রস্তুতি চলে সংগোপনে। সাধারণের দৃষ্টির বাইরে তাদের সংহতি। তাদের নেতার নির্দেশে বিশেষ জায়গায় বিশেষ মুহূর্তে তারা দেখা দেয়। গেরিলারা নিজেদের আক্রমণ শানাবার ব্যাপারে স্বাধীন—ঢাকঢোল পিটিয়ে সাধারণকে জানিয়ে দেবার প্রয়োজন তাদের নেই। কৃষকদের সমূহ অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য তারা কখনো মুখোমুখি যুদ্ধে নেমে আসে না। তারা জানে, ক্রমাগত আক্রমণে শত্রুর মনবল ও অস্ত্রবল ঘায়েল করতে পারলেই, এই দাপট দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসবে। শত্রুকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করতে পারলে আর এমন অত্যাচার

---

* ভেনেজুয়েলার গেরিলাদের বলা হয় FALN—প্রধান নেতা ডাগলাস ব্রেভো; গুয়েতেমালার গেরিলাদের নাম FAR।

চলবে না। গেরিলাদের প্রধান লক্ষ্যই হলো, চোরাগোপ্তা আক্রমণে শত্রুর সামরিক শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা—প্রতিপক্ষের রসদ ও গোলাবারুদ ধ্বংস করা অথবা ছিনিয়ে নেওয়া। গেরিলারা শত্রুর আক্রমণের আশায় দিন গোণে না, তারাই সুযোগ মতো শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের মতলব হাসিল ক'রে নেবে। প্রতিক্ষেত্রেই গেরিলাদের কিন্তু নজর রাখতে হবে, স্থানীয় অধিবাসীরা যেন তাদের আক্রমণের মুখে না পড়ে যায়।··

গেরিলারা সব সময়ই সঞ্চরণশীল। কোথাও থেমে পড়া মানেই অহেতুক বিপদ ডেকে আনা। সাধারণের সহযোগিতায় গোপন খবর সংগ্রহ গেরিলা নীতির একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু এই খবর আদান-প্রদানের ব্যাপারটা চলে অতি গোপনে। এমন কি গেরিলারা নিজেরাও জানে না, কে বা কারা তাদের সতর্ক ক'রে দিচ্ছে। শুধুমাত্র অল্প কয়েকজন নেতা এই Net work of contacts এর হদিশ রাখেন।

আক্রমণের সাথে সাথে আত্মরক্ষার প্রশ্নটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গেরিলারা এখানে তিনটি ব্যবস্থার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকে : Constant vigilance, Constant mistrust, Constant mobility.

নিরাপত্তা বজায় রাখতে এর চেয়ে বড় সত্য আর হয় না। সতর্ক থাকতে হবে, সাধারণ লোক, এমন কি সংবাদদাতারাও যেন গেরিলাদের মূল ঘাঁটির সন্ধান না পেয়ে যায়। কারণ, শত্রু খবর আদায় করবার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থাই নিয়ে থাকে। তারা গ্রামবাসীর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়—সেই অত্যাচারের মুখে যে কোন লোকই সত্য ফাঁস করে দিতে পারে। শত্রু তাদের লোভ দেখায় —মোটা পুরস্কারের আশায় মানুষ তার নীতিবোধ সহজেই বিসর্জন দিতে পারে। গেরিলারা তাই অতন্দ্র, খুব হুঁশিয়ার! ফিদেলের এক বিশ্বস্ত সংবাদদাতা ইউতিমো গুয়েরা প্রতিক্রীয়াশীলদের কাছে

থেকে দশহাজার পেসো* ঘুষ খেয়ে ফিদেলকে খুন করতে গিয়েছিল। সচেতন ফিদেল টের পেয়ে যান। গুয়েরার প্রাণদণ্ড হয়।' চে তাই বলেছেন: We hid our intentions from the Peasants and if one of them passed near the scene of an ambush, we held him until the operation was completed.

আর একবার সন্দেহের গন্ধ পেলেই গেরিলারা তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করবে। পিছনে কোন সূত্র না রেখেই তারা কর্পূরের মতো উবে যাবে।

ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন, গেরিলা ইউনিটের নতুন সদস্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব মোটেই আশ্চর্যের নয়। পরিস্থিতির অভাব মোটেই আশ্চর্যের নয়। পরিস্থিতি তাদের হতাশ করতে পারে। তারা দেখছে, আগামী দিনগুলি অতি নির্মম, অতি মর্মান্তিক, একেবারে অনিশ্চিত। তারা হয়তো ভাবছে, এমন চোরা গোপ্তা আক্রমণ শানিয়ে কোনদিন প্রকৃত সাফল্য তাদের করায়ত্ত হবে না। অথচ অমানুষিক পরিশ্রম, রাতজাগা ক্লান্তি, সব সময় আক্রমণের ভয়ে তটস্থ, খাদ্যাভাব, জলাভাব, রসদের অভাব, প্রতিটি বুলেট ব্যয় করতে হয় হিসেব করে, আত্মীয়-পরিজন থেকে অনেক দূরে, দুর্গম জলা অথবা দুর্ভেদ্য বন, পোকা-মাকড়ের উৎপাত, চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত নেই, প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত—এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সাথে ক'জন নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে? তরুণ গেরিলারা অনেক সময় বন ছেড়ে, উপত্যকা থেকে নেমে এসে, বিস্ময়ে দূরে শত্রুর শিবিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা পরিমাপ করে, গেরিলাদের তুলনায় ওদের প্রস্তুতি ও শক্তি কত বেশি। ওদের রয়েছে আধুনিক বোমারু, বহু হেলিকপ্টার, স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র, প্রচুর রসদ-ভাণ্ডার আর কাতারে কাতারে সুশিক্ষিত

* পেসো কিউবান মুদ্রা।

সেনা। এদের সাথে মুষ্টিমেয় ছড়ানো ছিটানো গেরিলাদের যেন তুলনাই হয়না। নবীন গেরিলাকে হতাশা ও অবসাদে গ্রাস করে। সে তার আত্মবিশ্বাস হারায়, আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে নিরাপদ সুখ-শান্তির জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তে গেরিলাদের প্রয়াসকে তার মনে হয়, হাস্যকর—ছেলেখেলা।

এরকম দুর্বল চিত্ততা ও অবসাদকে মুছে ফেলতে হবে। আরো দ্রুততা, আরো তৎপরতার মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। চাই আরো সতর্কতা, প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখতে হবে। সুখ ও স্বস্তির জন্য লালায়িত হবার সময় সেটা নয়। তারা যখন প্রমাণ করতে পারবে, তারাই গণস্বার্থের রক্ষাকবচ, জনতা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এগিয়ে আসবে সেই প্রচণ্ড সংগ্রামের সামিল হতে। কিন্তু গেরিলারা যদি কখনো একটি বিশেষ জায়গায় নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে, তবে সেটা স্ব-নিরাপত্তার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। তারা হয়তো আপাতঃভাবে স্থানীয় জনগণকে শত্রুর অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পারবে, কিন্তু পরিণামে তারা গোটা মুক্তিযুদ্ধকে পিছিয়ে দেবে এবং শত্রুর সুপরিকল্পিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হবে। স্ব-নিরাপত্তা তাই আসলে জনগণকে রক্ষা করে না, বরং তাদের সর্বনাশ করে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে গেরিলা-নায়ক গিয়াপ তাই বলেছিলেন ঃ

> "Allowing oneself to be attacked or limiting oneself to passive defence is to place oneself in the position of being unable to protect the population and to expose one's own forces to attrition. On the other hand, to seek for ways to attack the enemy is to put him on the permanent defensive, to exhaust him and prevent him from expanding his activities, to wrest the initiative

from him, and to impede his search operations. Here we have the best way to fulfil our glorious mission of protecting the population."

ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে যা ছিল উপলব্ধ সত্য, আজকের সংগ্রামী লাতিন অ্যামেরিকায় সেটা আরো ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য।

ছত্রের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়ঃ সশস্ত্র প্রচার (Armed Propaganda)।

গেরিলা সংগ্রামের অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। গণ সমর্থন একে পেতেই হবে, না হলে সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ। জনগণ হয়তো প্রথমে এই ধরণের সংগ্রামের সামিল হবে না। কিন্তু তাদের বোঝাতে হবে, এর রাজনৈতিক প্রয়োজন আছে—বিপ্লবকে সফল করতে হলে এটাই হলো সর্বাধুনিক সঠিক পথ। তাদেরকে জানাতে হবে, এটাই হলো 'জনগণের যুদ্ধ' (war of the people)। জনতাকে স্ব-মতে আনবার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া অত্যাবশ্যক। মাঝে মাঝে তাদের নিয়ে পাঠচক্র খোলা হবে, নেতারা প্রাঞ্জল বক্তৃতায় যুদ্ধের রীতিনীতি সাধারণকে বুঝিয়ে বলবেন, গ্রামবাসীদের মধ্যে হাজার হাজার ইস্তেহার বিলি করা হবে; এক কথায় ইংরেজিতে যাকে বলে, 'mass work', তাই বাস্তবায়িত হওয়া উচিত।

এই প্রচার-অভিযান চালাবার জন্য গেরিলারা কতকগুলি দলে ভাগ হয়ে যাবে। তারা হাজির হবে পাহাড়ী এলাকায়—পাহাড়ী উপজাতিদের দলে টানবে। নেমে আসবে সমতলের গ্রামগুলিতে —অসংখ্য ছোট ছোট সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের সংগ্রামমুখী ক'রে তুলবে। বিপ্লবের সামাজিক লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে মানুষের সামনে তুলে ধরবে তাদের আদর্শ। কৃষকরা তাদের মধ্যে দেখতে পাবে আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা—ভূমি-ব্যবস্থায় সামন্ত শোষকরা খতম হয়ে যাচ্ছে, শ্রেণীহীন সমাজে ভূমিহীন কৃষক নেই

ইত্যাদি। গ্রামের মধ্যেই প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার। গ্রামগুলিতেই গড়ে উঠতে পারবে যথার্থ সংগঠন। গ্রাম যখন জেগে উঠবে, তখনই শুরু হবে প্রকৃত যুদ্ধ। গ্রামবাসীরা গেরিলাদের খবর পাঠাবে, খুব সহজেই গুপ্তচরের কাজ করতে পারবে, আবার প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়বে হতবল বিভ্রান্ত শত্রু-সেনার ওপর। আন্তর্জাতিক সংগ্রামের দৃষ্টান্তগুলি এই নীতিকেই সমর্থন জানাচ্ছে।

ভিয়েতনামে ফরাসীদের বিরুদ্ধে গণবাহিনী গঠনে (১৯৪০-৪৫) এবং গণযুদ্ধ শুরু করতে এই সশস্ত্র প্রচার ব্যবস্থা খুব কার্যকরী হয়েছিল।...সেদিন ফরাসীদের কপালে যা জুটেছিল, আজ উত্তর অ্যামেরিকানদের ভাগ্যে তাই লেখা আছে। এটা অবিসংবাদী সত্য যে, একটা নিয়মিত বাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা যখন খতম হয়ে যায়, তখন সেই বাহিনীর পরাজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। গেরিলারা তাই সব সময় সুযোগ খোঁজে, কী ভাবে শত্রু-বাহিনীর সেরা অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় এবং আক্রমণ চালিয়ে তাকে মুছে ফেলা যায়। ভিয়েতনামে এমন ঘটনা ঘটেছিল। গেরিলারা হাজারো আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত রেখে ফরাসী বাহিনীর সেরা অংশকে দিয়েন বিয়েন ফুঁতে জমায়েত হতে বাধ্য করেছিল। সংখ্যা তাদের বড় কম নয়—ষোলো হাজার। সমর উপকরণেরও সেরা ভাণ্ডার তারা সেই পাহাড় ঘেরা জায়গায় এনে হাজির করেছিল। অথচ, তারা বুঝতেও পারেনি, গেরিলারা কৌশলে তাদের সেরা অংশকে এখানে এনে মরণ ফাঁদে ফেলেছে। তাই দিয়েন বিয়েন ফুঁ পৃথিবীর ইতিহাসে এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। মার্কিনদের অকৃপণ সাহায্যে পুষ্ট ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ঐ দিন কবরের তালায় আশ্রয় নিয়েছে। আর কোনদিন সে মুখব্যাদান করবে না। সেদিন টং কিং উপসাগরের তীরে যা ঘটেছিল, আজ ক্যারিবিয়ানে তারই পুনরাবৃত্তি হতে

চলেছে। সেদিন ফরাসীদের সাবেকী সাম্রাজ্যবাদ মুখ থুবড়ে পড়েছিল, আজ মার্কিনদের নয়া সাম্রাজ্যবাদের পালা।

গেরিলা যুদ্ধ রূপ নেয় গণযুদ্ধের। কিন্তু স্ত্রী লোক, শিশু বা বৃদ্ধের দল তো সাধারণতঃ সরাসরি লড়াইয়ের সামিল হতে পারে না। তা হলে তারা কি করবে? কি ভাবে তাদের কাজে লাগানো যাবে? হাঁ, তাদেরও অনেক কিছু করবার আছে—তাদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়! তারা উৎপাদনের কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখবে, —গণবাহিনীর খাদ্য ও রসদ উৎপন্ন করবে। মাঝে মাঝে অন্তর্ঘাত-মূলক কাজ কারবার চালিয়ে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। যাতায়াত ব্যবস্থাকে সুগম করবে। তাদের নিয়ে গঠিত হবে রাজনৈতিক বাহিনী, যে বাহিনী সংগ্রামরত গেরিলাদের বাইরে থেকে রক্ষা করবে। কিশোরদের রাজনৈতিক শিক্ষার সাথে সাথে অস্ত্রবিদ্যাতেও দীক্ষা দেওয়া হবে। ক্রমশঃ গোটা জাতিই সংগ্রামমুখী হয়ে উঠবে। এক কথায়, রাজনৈতিক সচেতনতার সাথে সামরিক দক্ষতায় তামাম দেশবাসী কুশলী হয়ে উঠবে। রাজনীতি অস্ত্রের পরিপূরক। একটি দুর্বল হয়ে পড়লে, অপরটিও পায়ের নীচ থেকে মাটি হারাবে।

ভিয়েতনামের মতো দেশে সশস্ত্র প্রচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রত্যেক মুক্তিকামী দেশেই তাদের সেই নীতিগুলিকে অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক:

(১) কৃষকদের ঘন বসতিবহুল গ্রাম, জনাকীর্ণ শহর—সর্বত্রই বিপ্লবের সংগঠকরা অনায়াসে মানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলবেন, প্রচার চালাবেন, জনগণকে সচেতন করে তুলবেন। মাছ যেমন জলের মধ্যে অবাধে বিচরণ করে, বিপ্লবীরাও তেমনি জনতার মধ্যে নিজেদের ছড়িয়ে দেবেন। চীন এই কৌশলকে ভালভাবেই কাজে লাগিয়েছিল। শত্রু তাঁদের হদিশ পায় না।

কারণ, ওরা তো দখলদারী। তারা যে নিয়মিত সৈনিক মাত্র— গ্রামীণ পরিবেশে থাকতে অনভ্যস্ত, গোটা দেশের স্পন্দন বুঝতে তারা একেবারেই অক্ষম। যেমন, ফরাসী বা ইয়াঙ্কিরা ভিয়েতনামীদের জীবনের সাথে কখনো একাত্ম হতে পারে নি; জাপানীরা পারে নি চীনে। গোটা দেশকে তো আর কেউ সৈন্য দিয়ে ঘিরে রাখতে পারে না। ফাঁক থাকবেই এবং সেই বিস্তীর্ণ মুক্তাঞ্চলে বিপ্লবীরা নিজেদের কাজ হাসিল করতে থাকবেন।

(২) যারা প্রচারে নেমেছেন, তাঁদের সাথে কিন্তু যুদ্ধরত গণবাহিনীর যোগাযোগ নিবিড় রাখতে হবে। তাঁরা কোন বিপদে পড়লে মুক্তিবাহিনী তাঁদের রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। আবার মুক্তিবাহিনীর নিত্য-নতুন সাফল্যের খবর তাঁরা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন, নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। তাঁদের হাতে রয়েছে যুক্তির তূণ। যুক্তি দিয়ে তাঁরা অনায়াসে বুঝিয়ে বলতে পারবেন: এই যুদ্ধ হলো স্বাধীনতার যুদ্ধ। জনতার যুদ্ধ। আমরা এক বিদেশী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছি। আপনারা জানেন, ওদের ভাষা ভিন্ন, কৃষ্টি ভিন্ন। ওরা এসেছে নিছক শোষণ চালাতে—আমাদের সমস্ত অধিকার নিশ্চিহ্ন করে দিতে। ভিয়েতনামীরা এভাবেই গণযুদ্ধের সাথে সাথে গণমতও গঠন করতে পেরেছিল।

তবে ভিয়েতনামের সাথে লাতিন অ্যামেরিকার অবস্থার কিছুটা তফাৎ অবশ্যই আছে: ভিয়েতনামের বেলায় আগেই প্রধান যুদ্ধরত বাহিনী গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয় নি, আনুসঙ্গিক দলগুলিকে জোরদার করা হয়েছিল। কিন্তু লাতিন অ্যামেরিকায় প্রথমেই সশস্ত্র গেরিলাদের তৈরী করা হয়েছে, তারপর আধা-নিয়মিত বাহিনীকে তালিম দেওয়া হয়েছে; সবশেষে চূড়ান্ত জয়ের পর গড়ে তোলা হয়েছে প্রকৃত সামরিক বাহিনী।…

লাতিন অ্যামেরিকার বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে আমরা কি দেখতে পাই ?

(ক) গেরিলা ফোকোগুলি [Focos] তাদের প্রাথমিক কাজ শুরু করে বেশ বড়সড় জায়গা নিয়ে ; তাদের সতর্কতা কিন্তু সেই তুলনায় অনেক আঁটো সাঁটো। উদাহরণ টেনে বলা যায়, আনদেন গ্রামে কোন আগন্তুক অবাধে নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারবেন না—স্থানীয় প্রত্যেকেই তাঁর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখবে। যে কোন নতুন মানুষই সন্দেহের কারণ। 'Out sider' বিশেষতঃ 'White man'-কে মায়ান গরিলারা বিশ্বাস করবে কোন ভরষায় ?

তারা ভালো করেই জানে, সুন্দর সুন্দর কথার জাল বুনলেই পেট ভরবে না, বোমাবাজিও বন্ধ হবে না। গরীব কৃষকরা আজ বুঝেছে, যার যতটুকু শক্তি আছে, তা নিয়েই রুখে দাঁড়াতে হবে। কথার চেয়ে কাজ অনেক বড়। গেরিলারা কাজের মধ্য দিয়েই জনগণের মধ্যে আস্থার সঞ্চার করতে পারছে। কিছুদিন আগেও লোকে 'গ্রীন বেরেটস' 'রেঞ্জার ডিভিশন' 'সশস্ত্র পুলিশবাহিনী' ইত্যাদিকে সমীহ করে চলতো, তাদের জঙ্গীদাপটকে অভেদ্য মনে করতো। আজ পট পরিবর্তনের পালা। গেরিলারা প্রমাণ করেছে, ঐ সব জবরদস্ত লোকেরা বুলেট-প্রুফ নয়, ওদেরও ঘায়েল করা যায়। ফিদেল তাই বলেছেন, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাচ্ছে —শোষণবাদী পল্টনদের দুরবস্থা তাদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে। অবশ্য অহেতুক ঝুঁকি যাতে কেউ না নেয়, সেদিকেও গেরিলা-নেতাদের সতর্ক দৃষ্টি। তাঁরা বলছেন, শত্রু পর্যুদস্ত হবে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ওদের শক্তি ও প্রস্তুতিকে কখনো ছোটো ক'রে দেখবে না। উৎসাহের প্রাবল্যে গ্রামের কৃষকরা আজ বন্দুক ধরেছে ঠিকই, কিন্তু অযথা যেন তারা বীরত্ব দেখাতে গিয়ে নির্মম-ভাবে বিধ্বস্ত না হয়ে যায়। গেরিলা যুদ্ধের কায়দা-কানুন আলাদা।

সেই নিয়মগুলি মেনে যুদ্ধ করতে পারলেই শক্তিশালী শত্রুকে খতম করা যায়, অন্যথায় নয়।

(খ) নতুন কায়দা শুধু গোরিলারাই উদ্ভাবন করে নি, প্রতিপক্ষও তাদের যুদ্ধের ধারা বদলে ফেলেছে। ওরাও লাতিন অ্যামেরিকার অন্ত-প্রত্যন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। পিল পিল করে ঢুকছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ক'রে জঙ্গল ও পাহাড় গুলিতেও অনুপ্রবেশ করতে পারছে। ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, পেরু ও বলিভিয়ায় তাদের এমন অনুপ্রবেশ সত্যই ব্যাপক। সামাজিক কারিগরী ও অর্থনৈতিক সাহায্যের মুখোশ এঁটে ইয়াঙ্কিরা জোর গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে লাতিন অ্যামেরিকার দেশে দেশে। সি-আই-এ [C I A] তো রয়েছেই, তা ছাড়া কাজ করছে ও-এ-এস্ [O A S]। বিপজ্জনক এলাকার [Danger area] প্রতি পরিবারের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তিগত টুকিটাকি সমস্ত খবরই এই ও-এ-এস্ নিপুন দক্ষতায় সংগ্রহ করে থাকে। লাতিন অ্যামেরিকার বিভিন্ন দেশে এক একটি কোড নামে তাদের কাজ চলেছে। যেমন, বলিভিয়ায় তাদের কোড নামে plan 204, কলম্বিয়াতে Simpatico, আর্জেন্টিনায় F O B 430, চিলিতে Comelot, পেরুতে Colony ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর আছে শুভেচ্ছা মিশন, উন্নত চাষ শেখাবার জন্য বিশেষজ্ঞের দল প্রভৃতি। এই সব দল-উপদলের মারফৎ মার্কিনীরা গ্রামীণ অঞ্চলে ব্যাপক অনুপ্রবেশ করছে। জনগণের মন জয়ের জন্য তাদের চেষ্টার কসুর নেই। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করছেন, দারুণ ধৈর্য নিয়ে মানুষের মনে রেখাপাত করছেন, এমনকি অনেক জায়গায় পরিস্থিতির চাপে তাঁদের সত্যিকারের ত্যাগ স্বীকারও করতে হচ্ছে। লাতিন অ্যামেরিকায় অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলেও আজ মিশনারী ও ক্যাথলিক চার্চের বিস্তার লক্ষণীয়। এরাও পরোক্ষভাবে ক্ষমতাসীনদের প্রতি গণসহানুভূতি আদায় করে নিচ্ছেন। সুতরাং

বিপ্লবের পক্ষে পরিস্থিতি এখানে জটিল, অনুকূল মোটেই নয়।

(গ) সবশেষে, লাতিন অ্যামেরিকার অধিকাংশ দেশেই সুসংহত নিয়মিত অথবা, আধা-নিয়মিত বিপ্লবী বাহিনীর অস্তিত্ব নেই। মাত্র সশস্ত্র প্রচার ব্যবস্থা তাদের 'Political recruting' শুরু ক'রে দিয়েছে। গ্রামগুলিতে তাঁরা ঢুকছেন, জনগণের মধ্যে মিশে যাচ্ছেন এবং সভা করছেন। কিন্তু বাস্তবে এই সব গ্রামের গরিব লোকেরা কি ভাবে তাদের শ্রেণীশত্রুর হাত থেকে মুক্তি পাবে? খুব সামান্য অস্ত্রই তাদের হাতে এসেছে। যদি তরুণরা গেরিলা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যোগী হয়, তাদের অস্ত্রসজ্জিত করা হবে কি ভাবে? অত অস্ত্র কোথায়?

অনেক কমরেড বাতলে থাকেন, সশস্ত্র প্রচার যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে কিছুটা গেরিলা তৎপরতাও দেখানো বিধেয়। শত্রুর ভাণ্ডারের ওপর আক্রমণ শানিয়ে অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারলে গ্রামবাসীদের উপর উদ্দীপনার সঞ্চার হবে, তারা দলে দলে বুক সাহসে বেধে এগিয়ে আসবে মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাতে। একশ'টা বক্তৃতা দেওয়ার চাইতে সেনাদের কোন অস্ত্রবাহী ট্রাক লুঠ করা কিংবা, কোন অত্যাচারী পুলিশ পেট্রোলকে খতম ক'রে দেওয়া অনেক বেশি কার্যকরী—অনেক বেশী সাড়া জাগে তাতে স্থানীয় লোকদের মনে। এই ধরণের ঘটনায় ওদের প্রত্যয় জন্মে, বিপ্লব এগিয়ে চলেছে! শত্রু আর নিজের দাপট দেখাবার সুযোগ পাবে না। এই সব ঘটনার ফলেই তারা বুঝবে, একজন সৈনিক মানেই একজন দুশমন—তাদের সকলের দুশমন—এবং এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, যে যুদ্ধে জয়লাভ তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মের ওপর নির্ভর করছে। জনগণের এই বোধটুকু জন্মে গেলে বক্তৃতা দেওয়া চলে এবং তারা সেই বক্তৃতার মর্মার্থ সাগ্রহে গ্রহণ করবে।

এ রকম চোরাগোপ্তা আক্রমণ শানিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের

হাতিয়ার যোগার করে, শত্রুর সামরিক সামর্থ্যকে বিশেষভাবে পঙ্গু করে ফেলে; সাথে সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতাও বিস্তৃত হয়। গোটা দেশ জুড়ে আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। সভা ক'রে ভাষণ দেবার প্রয়োজন হয় না। উল্লেখযোগ্য, দু বছরের দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধ চলাকালীন ফিদেল কাস্ত্রো একটিও জনসভার আয়োজন করেন নি। প্রয়োজন হয় নি।

তবু সশস্ত্র প্রচারকে সব সময় সক্রিয় ক'রে রাখা উচিত। বিরাট এলাকা জুড়ে এ রকম মহড়া নেবার জন্য গেরিলারা কতকগুলি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যায়; এক একটি দলে তিন থেকে দশ জন; তারাই যত বেশি সংখ্যক সম্ভব গ্রামগুলিতে কাজ শুরু করে দেয়। এর একটা বিশেষ সুবিধা হলো: বিস্তৃত এলাকা জুড়ে প্রাথমিক তৎপরতা আরম্ভ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ খাদ্য ও অন্যান্য উপাদানের জন্য ভাবতে হয় না। তৃতীয়তঃ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে গেরিলাদের প্রতি একই সাথে সমর্থনের সুর ধ্বনিত হয়।

কিন্তু আবার সেই পুরনো কথায় আসতে হচ্ছে, এ ধরণের প্রচার চালাতে আপত্তি নেই, তবে দেখতে হবে এর দ্বারা সাময়িকভাবে গেরিলারা কতটুকু লাভবান হচ্ছেন? আবার তাই আক্রমণাত্মক তৎপরতার ওপর জোর দিতে হচ্ছে। আজকাল আরো নতুন ভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে। অনেকেরই অভিমত, গেরিলারা অত ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়লে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং প্রতিক্ষেত্রেই শত্রু বেশী ক্ষমতার অধিকারী বলে তাদের খতম করে ফেলবে। 'The guerrilla forces are weak everywhere and the enemy, however scattered he may be, is strong everywhere.'

কখনো ঢালু, কখনো চড়াই, দুর্গমতাকে পায়ে-পায়ে ঠেলে এগিয়ে যাবার ফাঁকে ফাঁকে অনেক সমস্যার ছড়ানো জাল এক একটি বিশৃঙ্খল প্রতিরোধ গড়ে তুলছে—অপেক্ষমান বিপদ

সেখানে নির্ধারিত শক্তিতে আক্রমণ করবেই। এক নীতির সাথে আর এক নীতির চোখাচোখি হলেই বিভ্রান্তি ফেনিয়ে ওঠে। চৈনিক গেরিলা পদ্ধতির অনুসরণে গেরিলাদের তুলনা করা যায়, পাঁচ আঙ্গুলের এক মুষ্টির সাথে। গেরিলারা অনেক সময় সেই মুষ্টিকে বদ্ধ না করে পাঁচটি আঙ্গুলই খুলে দেয়, এতে শত্রু এক একটি আঙ্গুলকে মুষ্টিবদ্ধ শক্তিতে আঘাত হানতে পারে এবং ফলতঃ গেরিলারা নির্মম ভাবে মার খায়। তত্ত্বগত ভাবে পরিচালিত যুদ্ধ সব সময় যে জয়ী হবে, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। পরিস্থিতি অনুযায়ী ধারা পাল্টাতেই হবে, উদ্যোগ-নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। লাতিন অ্যামেরিকায় গুয়েতেমালা, ভেনেজুয়েলা ইত্যাদি দেশে গেরিলাযুদ্ধ তার অগ্রগতির পথে হরেক রকম প্রায় অনুদ্ধারণীয় ও অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন। বিভিন্ন দলগত রাজনৈতিক কচ-কচানিতে গেরিলারাও সেখানে বিব্রত। গেরিলারা নিজেরাই এক একটি রাজনৈতিক শ্লোগানের সামিল হয়ে ভেঙ্গে ছত্রাক্ষাণ হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষও কম নয়—ব্যালেনটাইন হুইস্কির ঝাঁজালো স্বাদ নিয়ে তারা যেন ব্যক্তিগত সন্ত্রাসকেই প্রাধান্য দিয়ে বসেছে। দীর্ঘদিন প্রকৃত সংগ্রাম থেকে গা বাঁচিয়ে চলায় নিজেদের ধারালো আত্মবিশ্বাসও থিতিয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের বিভেদকামী দর্শন নিয়ে গেরিলাদের রীতিমত বিভ্রান্ত ক'রে তুলছে,—যখন মানুষ শোষণের চাপে বিধ্বস্ত, যখন মায়েরা তাদের শিশুদের মুখে পুষ্টিকর খাবার তুলে দিতে পারছে না, যখন পুঁজিবাদীদের পৃথিবীজোড়া ষড়যন্ত্র হাজার হাজার মেহনতী মানুষ মাছির মতো মরে যাচ্ছে, তখনো এই দলগুলি হরেক রকম গালভরা বুলি কপচে পরোক্ষে ঝানু বুর্জোয়াদেরই মদত্ দিয়ে চলেছে। এদেরই চক্রবৎ বাক্যজালে আটকে পড়ে অনেক জায়গাতেই গেরিলারা আর তেমন সফল হতে পারছে না। সংখ্যায় ও শক্তিতে তাদের বৃদ্ধি আর লক্ষণীয় নয়। ইতিমধ্যে

শত্রুরা এমন পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে শুরু করেছে। তারা টাকা ছড়াচ্ছে—গেরিলাদের নৈতিক শক্তি হাঁটু ভেঙ্গে পড়ছে। তারা আক্রমণ চালাচ্ছে—অপ্রস্তুত গেরিলারা বিধ্বস্ত হচ্ছে, সাদা পতাকা উড়িয়ে আত্মসমর্পণ করছে।

কিন্তু এর মানে কি এই যে, সশস্ত্র প্রচার স্থগিত রাখা উচিত? এর মানে কি এই যে, আর লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যুক্তিযুক্ত হবে না?

না, এমন কোন সিদ্ধান্ত নেবার পর্যায়ে ইতিহাস আমাদের ঠেলে পাঠায় নি। মনে রাখতে হবে, ছোট খাটো সংঘর্ষের মধ্যে ছোট খাটো সাফল্য আসবেই এবং এর প্রত্যেকটি সাফল্যেরই মূল্য অসাধারণ—সংগ্রামের পথে এরা এক একটি জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা। কায়েমী শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে যে তৎপরতা চলেছে, তাকে অব্যাহত রাখতেই হবে। বাঁধন ছেড়া গ্রীক পক্ষীরাজ ঘোড়া পেগেসাসের মতো অনমনীয় দুর্দমনীয় হতে হবে। সংঘ, সমিতি, জনহিতৈষণার ভেক ধরে যারা বিভেদ-মন্ত্র ছড়াচ্ছে, তাদের কথায় কান পাতলে চলবে না। স্বাধীন ও বিকশিত মানুষদের নিয়ে গঠিত গণ সংগঠন [mass organisation] সংগ্রামের মূল বনিয়াদকে সমর্থ রাখবে—ভবিষ্যৎ লড়াইয়ে এর ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। প্রোপাগাণ্ডার শক্তিকে কে অস্বীকার করতে পারে? জনগণ এরই মাধ্যমে বৈপ্লবিক শক্তির আস্বাদ লাভ করে, ভবিষ্যতে তারা সংগ্রামী বন্ধুদের 'কর' দেবে, বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি জানাবে, নিজেরাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবার দায়িত্ব নেবে, গেরিলাদের বিপদে নিরাপদ আশ্রয় দেবে, ট্রেঞ্চ খুঁড়তে সাহায্য করবে, খাদ্য ও রসদ সরবরাহের পশ্চাদ্‌ভূমিকে সযত্নে রক্ষা করবে, ভয়াবহ বোমাবর্ষণের মধ্যেও তারা প্রতিটি অঞ্চলকে এক একটি সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করবে।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান লাতিন অ্যামেরিকার অধিকাংশ গেরিলা সংগ্রামই ঠিক এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি।

কারণটা কি? সশস্ত্র সংগ্রামের মূল লক্ষ্য সশস্ত্র তৎপরতাকে জোরদার করা, যা তারা কার্যতঃ পেরে উঠছে না। এই প্রচার-ব্যস্ত যোদ্ধারা আভ্যন্তরীণ মতামত গঠনে এত বেশী জড়িয়ে পড়েন যে যুদ্ধরত বন্ধুদের সাথে অনেক সময়ই যোগসূত্রটি হারিয়ে ফেলেন। অথচ, আজকের দিনে সবচেয়ে কার্যকরী প্রচার হলো, সাফল্যের সাথে সামরিক আক্রমণ পরিচালনা করা। The main point is that under present conditions the most important form of Propaganda is successful military action.

আবার সশস্ত্র প্রচারের নামে বেশি মাতামাতি করাটা মস্ত বেকুবের কাজ। এতে শত্রু তাদের গোটা পরিকল্পনার হদিশ পেয়ে যাবে। ফলে গেরিলাদের ওপর কতকগুলি নিশ্চিত আক্রমণ এসে পড়বেই! তাদের খাদ্য ও রসদ শত্রুরা দখল করে নেবে অথবা, ধ্বংস করে ফেলবে! উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে হয়তো গেরিলাদের বেশ কয়েকটি ইউনিটকে খতমও করে ফেলতে পারে!

দুর্বলতা অন্যত্রও রয়েছে। আপনারা হয়তো খেয়াল করবেন, লাতিন অ্যামেরিকার বিভিন্ন দেশে গেরিলাদের এখনো লোকে নিছক অস্ত্রধারী ধ্বংসামোদীর দল ভেবে থাকে। এরকম ধারণা জন্মাবার কারণ কি? কারণ হলো নতুন পৃথিবী, নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে ঐ সব গেরিলাদের দুর্বল, বুদ্ধিভ্রষ্ট ধারণা। লাতিন অ্যামেরিকার ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজ তাদের যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে বলছে, তারা তা করছে না। ওরা অনুসরণ করবার চেষ্টা করছে ভিয়েতনামকে—হয়তো অচেতন ভাবেই চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না, ভিয়েতনাম আর লাতিন অ্যামেরিকা এক জিনিস নয়। পরিস্থিতির এখানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভিয়েতনামের অসংখ্য সংঘবদ্ধ মানুষের মিছিলের সাথে লাতিন অ্যামেরিকার শোষিত জনগণের হৃদয় ইচ্ছার ব্যবধান দুস্তর—অতি

দুস্তর। লাতিন্ অ্যামেরিকার কিউবায় সফল বিপ্লব হয়ে গেছে। কিন্তু ল্যাতিন অ্যামেরিকার অন্যান্য দেশ তার মর্মার্থ বুঝতে পারছে না। একটি বিপ্লবের বাইরের ছবিটাই সব নয়, তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা, আদর্শকে উপলব্ধি করবার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সার্থকতা! কিউবান বিপ্লবীদের কণ্ঠে উচ্চারিত Patria o Muerto শুধু মাত্র একটি শ্লোগান নয়, ওটাই তাঁদের মূলধন, যাকে অনুসরণ করে তাঁরা লা প্লেটার খণ্ড-যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে বাতিস্তার শেষ প্রতিরক্ষা ব্যূহকে পর্যন্ত বিধ্বস্ত করেছিলেন। যাঁরা মনে করেন, সাইমন বলিভারের মতো একটি মাত্র যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গোটা বিপ্লবকে সফল করবেন, তাঁরা এখনো মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। বলিভারের যুগের সাথে বর্তমান পরিস্থিতির কোন তুলনাই হয় না। আধুনিক বিপ্লব কোন একটি বিশেষ যুদ্ধজয়ের ওপর নির্ভর করে নেই। কিউবার ক্ষেত্রে বিপ্লবীরা একাধিকবার শত্রুর প্রচণ্ড রণবহরের আক্রমণে পিছিয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে আত্মগোপন করেছেন; কিন্তু সংগ্রাম তো তাঁদের খতম হয়ে যায় নি। আবার তাঁরা পাহাড় থেকে জেগে উঠেছেন, সমতলে নেমে এসে a war to death পরিচালনা করেছেন।...

রেজি দ্ব্রে পরবর্তী পর্যায়ে গেরিলাদের ঘাঁটি [Guerrilla Base] সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। গেরিলারা তাঁদের এই অবস্থানের জায়গা খুঁজতে গিয়েও অপরের দৃষ্টান্তকে আদর্শ মনে করে মারাত্মক বিপদের জালে বার বার জড়িয়ে পড়ছে। প্রতিটি দেশের ভৌগলিক ও সামরিক পরিস্থিতি সাবধানে যাচাই ক'রে তবেই সংহতির ক্ষেত্র বেছে নেওয়া উচিত। এ দায়িত্ব গেরিলা-নেতৃত্বের। আমরা সেই সমস্যা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করতে পারি মাত্র। পেরুর কথাই ধরা যাক। সেখানকার বর্তমান ঘটনাবলী দেখে তো মনে হয়, মাও সে-তুং-এর সেই ১৯৩৮-এর

ভাবনা Problems of strategy in Guerrilla War Against Japan তাদের মাথায় চেপে বসেছে এবং কিউবান বিপ্লবের প্রতীতিতে সেই ধারণাটা যেন রঙ চড়াচ্ছে। আশ্চর্যের নয়। কারণ, ছাপাখানা গুলি তো তাদের পরিধি দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলেছে। Monthly Review, M I R * ইত্যাদি ম্যাগাজিনের দল মগজ ধোলাইয়ের কাজে অক্লান্ত—এখান থেকে, সেখান থেকে উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্ত তুলে তাঁরা প্রমাণ করে ছাড়বেন, কিউবা বিপ্লবের রণ-কৌশল একেবারে ভুল! উত্তর অ্যামেরিকার এমন সব প্রগতিবাদী চিন্তানায়করা কিউবার বৈপ্লবিক সাধনাকে নিছক একটা Cuban strategy হিসাবে ব্যাখ্যা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। পেরুর ক্ষেত্রে এই কৌশল কেমন কাজ করবে, তারই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুবারম্যান এবং স্যুজী দিব্যি কলমবাজি করলেন:

> ["Fidel Castro's strategy] Called for the establishment of a guerrilla-controlled "Security zone" in the mountains which would become the focus of revolutionary attroation and development, leading eventually, as in Cuba, to a full-scale war against the Peruvian armed forces ....De la Puente's main addition was that because of Peru's much greater size there should not be one or two but half a dozen or more guerrilla zones." *

যেহেতু, এই সমস্ত ভদ্রলোকরা বুর্জোয়া চিন্তাবিদ্, কাজেই তাঁরা প্রথমেই রণকৌশলের [Strategy] প্রশ্নটি তুলেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ

আসল প্রসঙ্গটি এড়িয়ে তাঁরা ঐ একটি বিষয়ের ওপরই নিজেদের অভিমতকে মেলে ধরেছেন। আরো দুর্ভাগ্য, আমরা ঐ সব তত্ত্বকে বড় বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছি। আমরা সহজেই ওদের শিকারে পরিণত হচ্ছি। তারা যেটাকে আজ দেখছেন রণকৌশল হিসাবে, আমরা সংগ্রামের অনেক বিস্তৃত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, অনেকগুলি স্তর পার হয়ে, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিকে যাচাই করতে করতে সেখানে পৌঁছেছিলাম। কোন কৌশলই তো চূড়ান্ত নয়। একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী এবং তাঁদের সংগ্রাম-কৌশল গড়ে ওঠে রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী। জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক, তাদের শক্তির সীমাবদ্ধতা বা প্রসারতা, তাদের প্রতিপক্ষের সংখ্যা এবং অস্ত্রভাণ্ডার ইত্যাদি সমস্ত কিছুই রণকৌশল নির্ধারণে সাহায্য করে থাকে। এই সমস্ত পরিস্থিতিগুলি পর্যালোচনা করবার পরই বিপ্লবীরা সংগ্রামের পথ নির্ধারণ করে থাকেন। বিশেষতঃ, নিয়মিত সামরিক বাহিনীর চেয়ে গেরিলাদের এ সম্পর্কে অনেক বেশি অবহিত হতে হয়। কিউবার বিপ্লব সেই কৌশলগত দিকের একটা মাঝারি ধরণের উপমা মাত্র। বাস্তব শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে এটা একটা সুন্দর মাধ্যম। মনে রাখা দরকার, ফিদেল সংগ্রামের কালে নিজেদের বনিয়াদকে পোক্ত করবার জন্য অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনার ওপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন, যুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত প্রতিটি ছোট খাটো ঘটনাও তাঁর কাছে ছিল যথেষ্ট অর্থবহ। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি তাঁর নখ-দর্পণে প্রতিফলিত। কোথায় কোন ফ্রন্টে যুদ্ধ কেমন চলেছে, কাস্ত্রো খবর রাখতেন। কোথায় কোন জঙ্গলে গেরিলারা শত্রুর অপেক্ষায় ওৎ পেতে রয়েছে, কাস্ত্রো যেন সবই দেখতে পেতেন। এমন কি, প্রত্যেক গেরিলাকে কতগুলি করে বুলেট দেওয়া হয়েছে, তার পর্যন্ত হিসেব রাখতেন। ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতেন, ঠিক কোন পথে সৈন্য পরিচালনা যুক্তিযুক্ত হবে। মাইন পাতবার সময় এবং তাদের পরীক্ষার সময়. স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন।

খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিজে এসে দেখে যেতেন। কঠিন, অনমনীয় দৃঢ়তা ও দক্ষতার কী আশ্চর্য দৃষ্টান্ত! কিউবার বিপ্লবের 'রনকৌশল' আলোচনার আগে আমরা যেন সততার সাথে কিউবান গেরিলাদের অবস্থান ও তৎপরতা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেই। খুশী মতো মন্তব্য ক'রে বুর্জোয়া সমাজে ইনতেলেকচুয়াল হতে পারি। কিন্তু প্রকৃত সত্য সেখানে গোপনই থাকে।

গেরিলাদের অবস্থান-ভূমি বা যে জায়গা থেকে তাদের স্থায়ী সাহায্য আসতে থাকে, তার উপর চৈনিক গেরিলাযুদ্ধ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল। এই Guerrilla base গড়ে তুলতে হলে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা থাকা দরকার ঃ

(i) এটি একটি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে; আর স্বতসিদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা হবে অতি দুর্গম; এলাকার অন্তরতম স্থানে শত্রু তো প্রবেশ পথই খুঁজে পাবে না। [মাও সে-তুং তাঁর বইতে এই দুর্গমতার ওপর অত্যধিক জোর দিয়েছেন]।

(ii কিন্তু এখানে গ্রাম্য জনগণের বসবাস যথেষ্ট ঘন হবে। [অথচ, পেরুতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র নয়জনের বাস।]

(iii) কোন বন্ধুভাবাপন্ন দেশের সাথে এর সীমানা যুক্ত থাকাটা বাঞ্ছনীয় [যেমন, উত্তর ভিয়েৎনামের সীমানা-সংলগ্ন দেশ হলো লাল চীন]।

(iv) শত্রুর কোন বিমান ঘাঁটি থেকে অনেক দূরে হবে এর অবস্থান। বিমানবাহী সেনারা যেন স্থানটির হদিশ না পায়। কিন্তু লাতিন অ্যামেরিকায় তেমন পরিবেশ কোথায়? এখানে গেরিলাদের বিরুদ্ধে আধুনিক যুদ্ধের সব রকম ব্যবস্থাই নেওয়া হয়ে থাকে। স্থলে-অন্তরীক্ষে সমান তালে গেরিলাদের ওপর আক্রমণ চলে। ছত্রীবাহিনী নেমে আসে গেরিলাদের ঘাঁটির ওপর, ট্রান্সমিটারে দ্রুত খবর পাঠায় বাইরে—ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্যরা এসে ঘিরে ধরে গেরিলাদের; পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

(v) গেরিলা বা মুক্তিযোদ্ধাদের তুলনায় শত্রু-সেনার সংখ্যা বেশি হতে পারে না। কিন্তু এ তত্ত্ব কি সর্বত্র প্রযোজ্য? জাপানের বিরুদ্ধে লড়বার সময় চীনে এমন পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু লাতিন অ্যামেরিকায় ব্যাপারটা অত সহজ নয়। মনে রাখতে হবে, ১৯২৭ সালে কুয়েংমিটাং বাহিনীতে বিভেদের সৃষ্টি হলে সেই বাহিনীর একটা বিরাট দল তাঁদের অনেক কৃতি জেনারেল সহ কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে যোগ দেয় এবং তখন থেকেই বিপ্লবীদের পরিচালিত লালফৌজ এক নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। জাপ আক্রমণের অনেক আগেই চীনের লালফৌজ তার শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবেলা করতে গিয়ে লালফৌজ নিজেকে আরো সমৃদ্ধতর করেছে—১৯৩৭ সনে তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার, আর ১৯৪৫ সনে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো এক লক্ষে। সুতরাং, গেরিলা যুদ্ধের সাথে সাথে আর এক শক্ত বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে চীনারা তাদের সংগ্রাম শুরু করেছিল।

লাতিন অ্যামেরিকায় উপরিউক্ত একটি সুবিধাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই এখানকার বিপ্লবীদের কি উচিত নয় কিউবার বিপ্লব ও অতি সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা?

আমরা শুধু খবরের কাগজ পড়ে আন্দাজ করতে পারি, গেরিলারা কী ভয়াবহ বিপদ মাথায় নিয়ে সংগ্রামে নেমে পড়ে। যুদ্ধ যত চলে, মৃত্যুর হার ততই বাড়তে থাকে। শত্রু মনে করে, গেরিলারা নবগঠিত। সুতরাং খুব কম সময়ের মধ্যেই ওদের মুছে ফেলা সম্ভব হবে। কিন্তু যত দিন যায়, ততই সে অনুভব করতে পারে, গেরিলাদের মূল শিকড় কত গভীরে!

একজন ইয়াঙ্কি সামরিক উপদেষ্টা হয়তো স্বপ্ন দেখছেন। আমরা জানি, তাঁর স্বপ্নের বিষয়বস্তুটা কি! তিনি স্বপ্ন দেখছেন,

সদ্য গড়ে তোলা গেরিলাদের এক শিবিরকে ধূলোয় মিশিয়ে দেবার জন্য আকাশ বেয়ে হাজার হাজার ছত্রী সেনা মাটির বুকে নেমে আসছে। সৌভাগ্যবশতঃ, এমন স্বপ্ন বড় একটা বাস্তবায়িত হতে আমরা দেখি না। সময়ের কাঁটাকে হার মানিয়ে দৌড়াবার প্রয়াস যেমন কঠিন ও অনুশীলন স্বাপেক্ষ, গেরিলাদেরও তেমন কঠোর ত্যাগ স্বীকার করতে হয় আধুনিক সুগঠিত অত্যাচারী এক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে। এখানে গেরিলারা সময়টাকে ধরতে চাইছে, আর সামরিক বাহিনী সেই সময়কে ছেড়ে দিতে চাইছে না; গেরিলারা শিখবার তাগিদ অনুভব করে, কিন্তু সামরিক বাহিনী তাকে শিখবার সুযোগ না দিতে বদ্ধপরিকর।

গেরিলারা চাইবে, তাদের অবস্থান যেন কেউ জানতে না পারে। কিন্তু সামরিক বাহিনী তাদের নিশ্বাস ফেলবার সময় দেবে না। পদাতিক বাহিনী সহজাত ক্রূঢ়তায় বন-পাহাড় তছনছ করতে থাকে—মেসিনগানের অজস্র বুলেট ব্যয় করে তারা প্রত্যাশা করে যে কোন মুহূর্তে কোন এক বিশেষ জায়গা থেকে এর প্রত্যুত্তর ভেসে আসবে। বিমান থেকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে বহু স্ন্যাপ নেওয়া হবে, কোন এক বিশেষ জায়গায় সন্দেহের গন্ধ পেলেই শুরু হবে আক্রমণ—মুষলধারায় বৃষ্টিপাতের মতো ন্যাপাম ইত্যাদিরা নেমে আসবে, দুর্জয় আদিপাপের মতো আকাশে প্যারাসুটের ছাতা উড়িয়ে মাটির পানে ধেয়ে আসতে থাকবে ছত্রী বাহিনী। সিংহের মুখে নিক্ষিপ্ত রোমান গ্ল্যাডিয়েটরদের মতো তখন বেপরোয়া গেরিলারা আত্মপ্রকাশে বাধ্য হবে। গেরিলাদের নির্দিষ্ট মুক্তাঞ্চলের হদিশ যদি একবার শত্রুরা পেয়ে যায়, তবে আত্মরক্ষা বড় কঠিন।

চীন বা ভিয়েতনাম যা-ই বলে থাকুক না কেন, গেরিলা অধ্যুসিত কোন বিশেষ এলাকাকে চিহ্নিত করবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। সেই এলাকা যত বড়-ই হোক না কেন, অহেতুক ঝুঁকি সেখানে আসবেই। তা ছাড়া, গেরিলারা এভাবে এক বিশেষ জায়গায় আবদ্ধ

হয়ে পড়লে তারা তাদের সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্রটি হারাবে। সেই অস্ত্র হলো তাদের গতিশীলতা। এক বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করাটা গেরিলাদের পক্ষে বিধেয় নয়; এর ফলে শত্রু অনেক সুবিধা পায়—তারা তাদের সর্বোত্তম বহরের ব্যাপক সমাবেশ ঘটিয়ে গেরিলাদের পর্যুদস্ত করতে পারে। অনেকে যুক্তি দেখান, প্রাকৃতিক সাহায্যে একেবারে অগম্য জায়গায় গেরিলারা নিশ্চয় তাদের স্থায়ী ঘাঁটি গড়ে তুলবে। এ রকম যুক্তি কিন্তু বর্তমান যুগে অসাড়। এ রকম সিদ্ধান্তে অবিচল থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আজকের দিনে কোন জায়গাই অগম্য নয়। যদি গেরিলারা সেখানে সমবেত হতে পারে, শত্রুরা কেন পারবে না? কিউবার গেরিলারা এ সম্পর্কে সচেতন ছিল। তাই তারা ছিল অদ্ভুত গতিশীল, শত্রু কখনো তাদের নাগাল পেত না। তাছাড়া বিশ্বাসঘাতকতারও তো ভয় আছে! আগেই বলা হয়েছে, গেরিলারা কখনো বিশ্বাসের লাগাম আলগা ক'রে দেয় না; যে লোকটা একবার ক্যাম্প ছেড়ে কাজে বেরিয়েছে, যে কোন মুহূর্তে সে শত্রুর দেওয়া টোপ গিলতে পারে। কাজেই এক জায়গায় অনড় হয়ে বসে থাকার অর্থ, নিজেদের রক্তে নিজেদের ঘাঁটিকেই প্লাবিত করা। সংগ্রামের প্রাথমিক স্তরে ঘন ঘন শিবির পরিবর্তন করতেই হবে। বিশেষ জায়গার মোহে আবিল হয়ে থাকবার মতো পরিস্থিতি তাদের নেই। camp sites were unavoidably temporary and subject to constant shifting during the first stage.…

১৯৫৭ এর শেষার্দ্ধ। কিউবার হোম'ব্রিতো উপত্যকার আশ্চর্য সাহসী গেরিলা নায়ক চে গুয়েভারা তাঁর ষাটজন সেরা সহযোদ্ধাকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। জায়গাটি তাঁর দারুণ পছন্দ হয়েছে। হরেক রকম নিবিড় গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে সান্ধ্য সোনালি জাল ছড়ানো, সবুজ আমেজ-ভরা বনপথ—অনায়াসেই এখানে এক

স্বয়ংসম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য পাকা ঘাঁটি গড়ে তোলা যায়। চে তড়িৎ তৎপরতায় কাজ শুরু ক'রে দিলেন। তাঁর ছিপছিপে টান শরীর, কপালে গভীর খাঁজ, পুরু ঠোঁটে ধরা হাভানার চুরুট, কোমর ছাড়িয়ে নামানো বেল্টে লটকানো আটঘোড়া চেম্বার—সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটা অস্থির ছায়ার মতো ছোটাছুটি করছে! কাজ করছেন, কাজ দেখছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। কোন কিছুরই খামতি নেই। তৈরী হলো একটি কার্যদপ্তর—লম্বা, সরু চতুষ্কোণ ঘর; মেঝেয় কোন আচ্ছাদন নেই, শুধু গুটি কয়েক চেয়ার ও টেবিল, একটি জানালা, তাকালে দু' একটা অসাধারণ দৃশ্য চোখে পড়বে। কোন বিলাস নেই, আত্মশ্লাঘা নেই।···বাইরে চে দুর্নিবার, দুর্মদ দৃঢ়তায় কাজ করে যাচ্ছেন। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থায়ী ঘাঁটি গড়ে তুলতে যা যা প্রয়োজন, সবই তিনি এখানে লভ্য ক'রে তুলবেন। খাবারের প্রশ্ন একটা বিরাট সমস্যা—চে তাই এখানে একটি রুটির কারখানা খুলে বসলেন। গেরিলাদের জুতো প্রায়ই ছিঁড়ে যায়—চে তাই একটি জুতো সারাবার দোকান খুললেন। তিনি নিজে কৃতি চিকিৎসক, একটি ছোটখাটো হাসপাতালও চালু হলো। একটি মিমিওগ্রাফ মেশিন এনে বসানো হলো এবং এই মেশিনের সাহায্যেই চে প্রথম তাঁর E L Cubano Libre ইস্তেহার লিখে বিলি করতে শুরু করেছিলেন। কাজের আনন্দ, স্বপ্নের মাদকতা, সংগ্রামের গৌরব নিয়ে সেখানকার প্রতিটি গেরিলা যেন বহুবর্ণরঞ্জিত। উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি খরস্রোতা নদী চে'র সৃজনীশক্তিকে আরো স্বপ্নগর্ভ করে তুলেছিল—তিনি ঐ স্রোত-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি ছোটখাটো অথচ, মজবুত ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট গড়ে তুলতে চাইলেন! ক্ষুধিতের চিৎকার, উৎপীড়িতের আর্তনাদ, পঙ্গুর হাহাশ্বাস দূর করবার জন্য চে সেদিন হোমব্রিতো উপত্যকায় এক সমর্থ স্থায়ী ঘাঁটি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু গেরিলা যুদ্ধে প্রস্তুতি হিসাবে এটা যে কত বড় ভ্রান্তি,

গুয়েভারা কিছুদিনের মধ্যেই টের পেয়ে গেলেন। শত্রু একদিন হদিশ পেয়ে গেল--একদল গেরিলা এখানে পাকাপাকি ভাবে শিকড় গেড়েছে, অতএব . প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ওদের আক্রমণ করলে সাফল্য অনিবার্য। হোমব্রিতো বৈরীবেষ্টিত হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। চে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তাঁর দুর্গ রক্ষা করতে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। শত্রুর সংখ্যা কল্পনাতীত, তাদের অস্ত্রসম্ভারও সীমাহীন, দু' দলের শক্তির তারতম্য মেরুপ্রতিম। যুদ্ধে গুয়েভারা স্বয়ং আহত হলেন। মৃত্যু অনিবার্য ছিল, কিন্তু হঠাৎ ফিদেল আর একদল গেরিলা নিয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁকে রক্ষা করেন।

হোমব্রিতোর এই অভিজ্ঞতাকে ফিদেল ও চে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। গেরিলাদের শিবির নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু কোন 'স্থায়ী' ঘাঁটি তৈরীর প্রবণতা বাঞ্ছনীয় নয়। The idea of a base was correct, but premature. যে বাহিনী সেদিন হোমব্রিতোর গেরিলা ঘাঁটিকে বিধ্বস্ত করেছিল, ফিদেলের নেতৃত্বে গেরিলারা সেই বাহিনীকেই পরে চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।···

আর একটি ভিন্ন জাতের উদাহরণ—১৯৫৮-এর এপ্রিল। সাত মাস ধরে তামাম কিউবায় যুদ্ধ চলেছে। বাতিস্তার আক্রমণে হিংস্রতার ঝলক। আর গেরিলাদের অগ্রগতিতে প্রগতির দ্যুতি—মানুষের মুক্তি তাদের লক্ষ্য। ক্ষুধা ও দাসত্ব থেকে মুক্তি। যেন তারা একটা মস্ত ম্যানহাটান স্কাইলাইনকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগিয়ে আসছে। বোমা, আগুন, মাইন, ডিনামাইট—ধ্বংসের তাণ্ডব চলেছে।··· বিদ্রোহী গেরিলারা সিয়েরা মেস্তার খানিকটা এলাকাকে মুক্তাঞ্চলে পরিণত করলো। কিন্তু তারা সেখানেই শিবির গেড়ে শত্রুর

আক্রমণের প্রতীক্ষায় দিন গুণলো না। তারা আরো এগিয়ে চললো সামনের দিকে, স্থানীয় লোকদের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো···পরিণামে দেখা গেল বাতিস্তার বিরুদ্ধে গোটা সিয়েরা মেস্তার জুড়ে এক বিরাট গণযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এটাই কিউবান বিপ্লবের অন্তর্রূপ, তার বহিঃরূপ দেখে এটা ধরা যায় না।

কলম্বিয়া, গুয়েতেমালা, পেরু ও ভেনেজুয়ালার সংগ্রামী বন্ধুদের উচিত কিউবার বিপ্লব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ; কারণ, ঐ সব দেশের পরিস্থিতির সাথে কিউবার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

In Cuba the occupation of a guerrilla base, however, decisive it may have been, was not the Number One political and military objective of the rebels. Objective Number One was, apparently, the destruction of the enemy's forces and, above all, the procurement of weapons. Current Guatemalan, Colombian, and Venezulean experiences appear to confirm the validity of the Cuban experience in this regard.

গেরিলাদের অবস্থান ভূমি সম্পর্কে আলোচনার পর দ্যব্রে মোড় নিয়েছেন পার্টি ও গেরিলাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে। অ্যামেরিকার অনেক দেশেই গেরিলাদের বলা হয়, মুক্তিসংগঠনের একটি সশস্ত্র দল। এর অর্থ হলো, গেরিলারা সর্বদাই কোন এক রাজনৈতিক দলের অংশমাত্র। এ রকম ধারণা জন্মেছে এশিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে। কিন্তু ক্যামিলো কিয়েনফুয়েগস্ অন্য রকম ব্যাখ্যা করেন : The rebel army is the people in uniform. দল বিশেষ নয়, জনগণই যখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইউনিফর্ম পরে

অস্ত্র ধরে বিশেষ রীতির সশস্ত্র সংগ্রামের সামিল হয়, তখনই গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। আর অন্য দেশে কি অনুসৃত হয়েছে বা হচ্ছে, তাকে লাতিন অ্যামেরিকার বুকে চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা করা উচিত নয়। হতে পারে তত্ত্বগত ভাবে সেই নীতি সেইসব দেশে আশ্চর্য সফল হয়েছে; কিন্তু লাতিন অ্যামেরিকার পরিস্থিতির সাথে তারা আদৌ খাপ খায় কিনা, যাচাই করে দেখা দরকার। মনে রাখবেন, একটি রাজনৈতিক ভুল হাজারটা সামরিক তৎপরতাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে; আর একটি সামরিক ভুল হয়তো একটি গেরিলা শিবিরের প্রাথমিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। লাতিন অ্যামেরিকার অনেক দেশে এমন ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়াতে সংগ্রামীদের অতি মর্মান্তিক মূল্য দিতে হয়েছে। ফিদেলের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়ঃ Certain policies belong to the field of Criminology.

এই সব মারাত্মক সিদ্ধান্তের যারা উৎস, সেই সব তথাকথিত নেতারা জাতির দৃষ্টিতে অপরাধী। অনেক বৈজয়ন্তসম্ভাবনাকে খুন করেছেন তাঁরা। ঘাতকের হাতে বধ্যকে তুলে দিয়েছেন। পরিণতি সম্পর্কে চোখ বুজে অবাস্তব কল্পনায় বুঁদ হয়ে থেকেছেন। অতীত-দৃষ্টান্ত তাঁদের মনে সম্মোহন এনেছে, বর্তমান বাস্তবকে অস্বীকার করেছেন!

যে রাজনৈতিক সংগঠন-পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই এবং যে দল তথাকথিত শান্তির সময়ে গণতান্ত্রিক তৎপরতা দেখাতেই অভ্যস্ত, যুদ্ধরত গেরিলাদের সেই দল কি নির্দেশ দেবে? আর সেই নির্দেশে যে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেবে তা এক রকম স্বতঃসিদ্ধ!

তবে আমাদের আরো কতকগুলি ব্যাপারে গভীর পর্যালোচনা চালানো দরকার। আমরা এমন কতকগুলি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবো, যেগুলিকে সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলা চলেঃ

(১) নগরপানে অবরোহণ

পাহাড় বা জঙ্গল থেকে শহরের দিকে মাঝে মাঝে গেরিলাদের হু' একজনকে নেমে আসবার কথা বলা হয়। কারণ, তাদের পার্টি নেতারা তো নিশ্চয় বড় সড় শহরের হৃদপিণ্ডে বাস করেন। রাজনীতিরও শির-উপশিরা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই জমাট বেধে আছে সেই ঝলমলে শহুরে আবেষ্টনীতে। অন্যান্য দলের নেতারা সেখানে গুলজার করেন, প্রেসগুলি সেখানেই ব্যস্ত, মন্ত্রীরা সেই শহরেই বাস করেন। আবার শিল্পের সর্বহারা শ্রমজীবীদের বস্তি ওখানেই,—কারখানাগুলি আকাশের দিকে গল গলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে, শ্রমিক-সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছে, ছাত্ররা জমায়েত হচ্ছে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে; এক কথায়, জনতার মূলশক্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত। গেরিলা-নেতৃত্বকে সেখানে স্বভাবতই আহ্বান জানানো হয়ে থাকে। অনেক সময় অবশ্য শহর থেকেই নির্দেশ পাঠানো হয়। কিন্তু রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দেবার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় সভায় ফ্রণ্ট থেকে হু' একজন গেরিলাকে তো অবশ্যই আসতে হবে! তারা এসে এদের সামনে ব্যাখ্যা করবে যুদ্ধের পরিস্থিতি; আবেদন জানাবে যথাযথ সাহায্যের জন্য; সর্বোপরি, তারা মনে রাখবে, এই প্রায় ভুলে যাওয়া শহরে বসবাসকারী নেতাদের কথা, যাঁরা বস্তুতঃ যুদ্ধ ও যুদ্ধসম্পর্কীয় সমস্যার সাথে কোনদিনই মুখোমুখি হন নি!

কিন্তু প্রশ্ন হলো, চাঁদের চেয়েও নির্জন ও বিচ্ছিন্ন জায়গা ছেড়ে গেরিলা নেতা অমন ভয়াবহ ঝুঁকি নিয়ে শহরের দিকে এগিয়ে আসবেন কোন সাহসে? আগে হোক, পরে হোক তিনি ধরা পড়ে যাবেন, সাথে সাথেই তাঁকে খুন করা হবে, কিংবা তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চলবে, হয়তো তিনি আত্মহত্যা করে দ্রুত অব্যাহতি চাইবেন। যদি গণমত সেখানে জাগ্রত থাকে, তা হলে বড় জোর তাঁকে কয়েদখানায় পাঠানো হতে পারে। কিন্তু সেখানেও প্রাচীরের অন্তরালে চলবে অকথনীয় অত্যাচার। যদি তিনি কখনো

পালাতে সক্ষম হন, তাহলেও পরিষ্কার শহরে তাঁকে ধরে ফেলা পুলিশের পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ হবে না। দৈব বা, 'আশ্চর্য ভাগ্য' বলতে হয়তো কিছু থাকতে পারে। কিন্তু সেটা নেহাৎই দুর্ঘটনা।

আমাদের ভুললে চলবে না, লাতিন অ্যামেরিকায় শ্রেণী-শত্রুরা বেছে বেছে তাদের হত্যা-লীলা [Selective assassination] চালাচ্ছে—তারা প্রতিপক্ষের নেতাদের জবাই করছে, অপর সকলকে ছেড়ে দিচ্ছে। এর ফলে দু' রকম সুবিধা তারা লাভ করে—প্রথমতঃ, নেতারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত সাধারণ যোদ্ধারা মরতে চায় না, সহজেই তারা তাদের নীতিবোধকে বিসর্জন দেয়। শাসকশ্রেণী খুব ভালোভাবেই জানেন, কাকে খুন করতে হবে—সেই সব রাজনৈতিক-সামরিক নেতাদের। তাঁরা আরো জানেন, কাকে কয়েদখানায় একবার স্থান দিয়ে আবার মুক্তি দিতে হবে—সেই সব বাক-চতুর কৌশলীদের, যারা রাজনীতি করতে এসে অস্ত্র ধরবার কথা ভাবতেও পারে না। যারা পাহাড়ে আত্মগোপন করেছে, যারা জঙ্গল থেকে তাদের আক্রমণ শানাচ্ছে, তাদের সাথে কোন আপোস চলে না। তাদের কাছ থেকে একমাত্র যুদ্ধই আশা করা যায়। দূর থেকে চাপ সৃষ্টি করে এদের নরম করা দূরুহ। সরাসরি ওদের নেতৃত্বের ওপর ছুরি চালাতে পারলে হয়তো ফল পাওয়া যাবে। আজকের দিনে যে কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি ভীত গেরিলাদের সম্পর্কে। এদেরকে মুছে ফেলবার জন্য তারা মার্কিন মদতে প্রায় জোটবদ্ধ বলা চলে। গেরিলাদের কী ভাবে ফাঁদে ফেলা যায়, এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। কি ভাবে গেরিলাদের তাদের 'বেস লাইন' থেকে টেনে আনা সম্ভব? অন্ততঃ তাদের দু' একজন নেতাকে কি ভাবে পাকড়াও করা যেতে পারে? ওরা যদি অভিজ্ঞ হয়, তবে কিন্তু অসম্ভব—সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ! হাঁ, পথ একটা খোলা আছে বটে।

মার্কিনী মুরুব্বীরা সেই পথেই উপদেশ দিয়ে থাকেন। পুলিশ এখানে ওৎ পেতে থাকে শহরের প্রবেশ-মুখে—গেরিলা-নেতাদের যদি কেউ কখনো সেখানে ঢুকবার চেষ্টা করেন, সহজেই ধরে ফেলতে পারবে তারা। শহরে কখনো না কখনো আসতেই হবে! অসুখ হলে বা আহত হলে চিকিৎসার জন্য আসতে পারে, কোন বিশ্বাস-ঘাতকের প্ররোচনাতেও চলে আসতে পারে। এমন হয়, গেরিলা-সংগ্রামের ইতিহাসে বহু নজীর আছে। ফিদেল তাই বলেছিলেন :

The City is a cemetery of revolutionaries and resources.

যদি গেরিলাদের কোন নেতা শিবির ছেড়ে শহরে আসবার চেষ্টা করেন, তাঁর সহযোদ্ধারা তবে ঘটনাটাকে হতাশাব্যঞ্জক বলে ধরে নেবে। গেরিলারা তাদের নেতার কাছ থেকে সাহস ও ত্যাগের দৃষ্টান্তই আশা করে। শহরে চিকিৎসার জন্য না ঢুকে, কোন ডাক্তারকে শিবিরে হরণ করে আনাটা অনেক বেশি উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে হবে তাদের কাছে। একজন গেরিলা নেতার পক্ষে শহরে গিয়ে রাজনৈতিক সভায় যোগ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। খবর বা নির্দেশ আসবে তাঁরই কাছে এবং বড়জোর কোন বিশেষ এক নিরাপদ স্থানে তিনি রাজনৈতিক জমায়েতে যোগ দিতে রাজি থাকতে পারেন।

(২) রাজনৈতিক শক্তির অভাব গেরিলাদের সামরিক ও নৈতিক দিক থেকে নগরের ওপর নির্ভরশীল করে রাখে। এই নির্ভরশীলতার জন্য নগর-নেতৃত্ব গেরিলাদের ত্যাগ করে।

শহরে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর যদি গেরিলাদের নির্ভর করে থাকতে হয়, তবে যে শুধু কতকগুলি বাস্তব অসুবিধের সৃষ্টি হবে তা নয়, এই নির্ভরতার জন্য গেরিলাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হীনমন্যতার সৃষ্টি হবে। যে কোন জিনিসের জন্যই তাদের বাইরের

দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। রাজনৈতিক কর্মী, সংগ্রামের নির্দেশ-পত্র, অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র, এমনকি, আক্রমণ চালাবার সময়-সূচীর জন্যও অপেক্ষা করতে হবে। এ যেন ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে শান্ত শান্ত মুখ নিয়ে শূন্য দৃষ্টি মেলে ধরা। বুদ্ধিটা রীতিমত ভোঁতা হয়ে যায়, আত্মবিশ্বাসে চিড় খায়, আত্মবিশ্বাস না থাকলে লড়ুয়ে মেজাজটা বা আসবে কোথা থেকে ? সাহসে ঘাটতি পড়ে। ভাবে খামকা কোন ধনী ম্লেচ্ছদের বিরুদ্ধে রাইফেল নিয়ে টানাটানি করছি ? এর চেয়ে ধরা দিয়ে আবার নিরাপদ নির্বিরোধ জীবনের সুখ-সাধনোচিতধামে প্রস্থান করাটাই যুক্তিযুক্ত।

কাজেই ঐ বাইরের প্রত্যাশায় দিন গুনার জন্যই একদিন গেরিলারা খতম হ'য়ে যাবে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে, অনেক রক্ত ঝরিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যে পরিস্থিতি তারা গড়ে তুলেছিল ধীরে ধীরে তার এক যন্ত্রণাদায়ক সমাপ্তি ঘটবে।

ধরা যাক, সাহায্য সময় মতো এলো না, গেরিলারা সেখানে কি করবে ? অথবা, সাহায্য পর্যাপ্ত হলো না, সেখানে কী করণীয় ? অথবা, যে সাহায্য অন্ততঃ তিন মাস আগে এসে পৌছানো উচিত ছিল, সেটা মাত্র আগামীকাল এসে হাজির হবে ? বুট, ওয়াটারপ্রুফ নাইলন কাপড়, গোলাবারুদ, পেট্রোল, ওষুধপত্র, ফ্ল্যাশলাইট ইত্যাদি। এখানে রাজনৈতিক নেতারা কি গেরিলাদের শিকলে বাঁধা কুকুরের মতো ধরে রাখবেন ?

এবং এটা স্বাভাবিক। এশিয়া বা য়ুরোপের শহরগুলির চাইতে ক্যারিবিয়ান সিটিগুলিতে ইয়াঙ্কিদের পসার অনেক বেশি জবরদস্ত। এয়ারপোর্টের ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে শুরু করে প্রতিটি অফিসের আনাচে-কানাচেতে তাদের অবাধ গতি। চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়টি তাদের এতটুকু অসতর্ক নয়। যে কোন রকম প্রস্তুতির নাম-ঠিকানা তাদের অজানা থাকবার কথা নয়। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ গোয়েন্দারা কি থোড়াই এখানে আসর জমিয়েছেন ? প্যান

অ্যামেরিকার বিমানগুলি অহরহ ওঠে-নামে—আকাশেও বুঝি ট্র্যাফিক জ্যাম। এমন শহরে বাস ক'রে সেই সব মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী নেতারা কি করবেন? বড় জোর, ছোট খাটো হাঙ্গামা হুজ্জৎ করতে পারেন; গেরিলাদের সম্পর্কে কতটুকু চিন্তা করতে পারেন? তিনি কি বুঝবেন গেরিলাদের কাছে ঐ এক গজ নাইলন কাপড়ের কত প্রয়োজন? তিনি কি ধারণা করতে পারেন, ঐ এক কৌটা বন্দুকের গ্রিস-তেল কী দারুণ দরকার পাহাড় বা জঙ্গলে আটকে থাকা গেরিলাদের কাছে? এক পাউণ্ড চিনি বা লবনের কী বাস্তব মূল্য থাকতে পারে গেরিলাদের কাছে, তাঁর হয়তো সেটা মাথাতেই ঢুকবে না! সত্য হলো এই যে, যদি আপনি কোনদিন গেরিলাদের কাছে থাকেন, তা হলেই বুঝবেন এই সব জিনিসের কত প্রয়োজন সেখানে। এক জোড়া বুট জুতোর জন্য তাদের যে জীবন-মরণ সমস্যা, সাধারণ রাজনৈতিক নেতার পক্ষে সেটা কল্পনা করাও অসম্ভব। দূর থেকে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত চাহিদাকে তাঁরা নানা কথার মারপ্যাচে ব্যাখ্যা করে থাকেন: 'details' 'material limitions' 'technical side' ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে তো আবার বিধান দেবেন: শ্রেণী সংগ্রাম এভাবে চলে না।

তা চলে না। বুর্জোয়া নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এ রকম অবস্থা একেবারে অসহনীয়। তাঁদের মতো পার্কে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দাও, প্রথম শ্রেণীর বন্দী হয়ে নিজের গৌরব বাড়াও, মাঝে মধ্যে নির্বাচনে জয়ী হয়ে মৌরুসী পাট্টায় সই লাগাও। শহরে বসে যাঁরা তত্ত্ব আওড়ান, একজন গেরিলার তুলনায় তাঁরা নিশ্চয় বুর্জোয়া। তাঁর মেজাজ আলাদা—জীবনের সুখ-সুবিধা অনেক। /মুখে খাবার তুলে নেবার জন্য, একটুখানি ঘুমোবার জন্য, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরে আসবার জন্য গেরিলাদের যে কী প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতে হয়,—এই সব শহুরে নেতাদের দুঃস্বপ্নেও তা ছায়া ফেলে না।

নগরবাসীদের হাতের কাছেই সব কিছু সাজানো থাকে। পকেটে টাকা থাকলেই হলো। তার উপর ইয়াঙ্কিরা তাদের সভ্যতার এমন আমদানি এখানে করেছে যে লোভ সামলানো দায়। হরেক রকম লুকোচুরি। একটুখানি স্খলন হলেই পয়সার অভাব থাকে না। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু ক'রে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী—সকলেরই ঐ এক দশা! রোগা লোক চোখের সামনে আলস্যে আর স্থূল ফুর্তিতে মোটা হতে আরম্ভ করে। জমানো ডলার ব্যাঙ্কের খাতায় ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। দেশের মেহনতী মানুষরা না খেয়ে গোল্লায় যাক, তিনি আর দেখতে আসবেন না! তুনিয়ার সেরা মদিরা সুন্দরীরা তাঁকে পরিবেশন করবে। কোনো জীবনবোধ নেই! মনের মধ্যে পায়খানা, আর মুখে হরিনাম!

নিয়নলাইটের মোহাঞ্জনে আঁকা শহর ও শহরতলি হারুন্ অল্ রসিদের এক একটি স্বপ্নপুরী যেন। দোকানে থরে থরে সাজানো সামগ্রী চোখ ঝলসে দেয়, রুটির স্তূপ বেরিয়ে আসছে, স্বয়ংক্রিয় কারখানা থেকে, জলের অফুরন্ত সরবরাহ, নিশ্চিন্তে ছাদের নীচে চোখ বোজা যায়, দূর থেকে ভেসে আসছে ক্লারিওনেট ও একর্ডিয়নের মিহি সুর···শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কাবু করতে পারে না। ফার্মেসী বা হস্‌পিটলে চিকিৎসার চমৎকার বন্দোবস্ত, সব রকম ওষুধপত্রই পাওয়া যায়।

আর পাহাড় ও জঙ্গলের জীবন? অনির্বান আদর্শ ছাড়া আর সেখানে কিছু নেই। গেরিলারা সেখানে প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকবার জন্য লড়াই করে চলেছে। গেরিলারাও মানুষ, তারাও একদিন ঐ শহর বা গ্রামের আরামপ্রদ জীবনের সাথে অভ্যস্ত ছিল। আজ সেই অতীতের আয়াসী অভ্যাসটাকে মুক্তি দিতে গিয়ে অসহনীয় কষ্ট হচ্ছে। প্রথম প্রথম তো সে নিজেকেই নিয়ে ব্যস্ত—তার সেই পুরনো অভ্যাসগুলিই প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ শত্রুকে জয় করা বড় কঠিন। অথচ, এ শত্রুকে জয় করতে না পারলে আগামী

মুক্তি যুদ্ধের সফল যোদ্ধা সে হতে পারবে না। অনেকেই কিন্তু এই অন্তর্নিহিত বৈরীকে খতম করতে পারে না, হাঁপিয়ে ওঠে, প্রতিটি ইন্দ্রিয় বিদ্রোহ ঘোষণা করে—কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তারা পালাতে থাকে। অনেকেই এমন পালিয়ে যায় গেরিলা জীবনের কাঠিন্য সইতে না পেরে। অনেক দলছুট আবার গিয়ে আশ্রয় নেয় সেই শহরে। গভীর হতাশায় তলিয়ে যায়। আত্মগ্লানি ঢাকতে গিয়ে আত্মপ্রবঞ্চক হয়ে ওঠে। গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজের ব্যর্থতাকে ভুলতে চায়।···

দলত্যাগের এমন ভয়াবহ হিড়িকে লাতিন অ্যামেরিকার বহু গেরিলাদলেরই মর্মান্তিক অবস্থা। শত্রুর আক্রমণ বা বিশ্বাসঘাতকতা এর কারণ নয়। আসল কারণ হলো, জীবনযাত্রার প্রতিকূল পরিস্থিতি। শহরের নেতারাও তাই চোখ বুজে থাকেন—গেরিলাদের সামিল হয়ে সংগ্রাম করাকে একেবারে অবাস্তব বলে মনে করেন। তাঁরা দূরের লোক, আরো দূরে সরে যান। গেরিলারা তখন নিজেরাই নিজেদের রসদ যোগার ক'রে নিতে তৎপর হয়ে ওঠে। ওরা শত্রুর নিকটবর্তী ঘাঁটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ছিনিয়ে নেয় নিজেদের প্রয়োজনীয় খাবার, গোলা-বারুদ, বুট, কাপড় ইত্যাদি। এক জায়গায় স্থিতিশীল না থেকে তারা তাই নিত্য নতুন ওয়ার ফ্রন্ট খুলতে থাকে। এটাই কিন্তু আবার শত্রুকে খতম করবার এবং নিজেদের রক্ষা করবার উপায়। নিজের এমন অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন ঃ

> "....We have decided to organise our apparatus for obtaining arms from abroad. After seventeen months, without receiving the slightest aid from the organisation (we received some aid a few weeks ago as the result of measures taken indipendently) it is indeed

difficult to trust in anything except own effort. More than 200,000 pesos have been spent but not a single gun or bullet has reached us ; A good part of what we expected from Mexico more than a year ago is in the hands of the enemy, in Pinan del Rio no less. The arms we needed so much were lost, consignment after consignment, because some comrades thought that it was neccessary to open other fronts rather to consolidate the one we already had." *

সামরিক নির্ভরতা

কয়েক মাস আগে থেকেই কোন সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা স্থির করা যায় না। এটা শাসক শ্রেণীর ক্যালেণ্ডারের পাতায় আঁকা থাকে না। অথবা, কোন নির্বাচনী বা রাজনৈতিক সভায় তা নির্ধারিত হয় না। এই পরিকল্পনা করবেন তাঁরাই, যাঁরা নিজেরাই যুদ্ধ করবেন। যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যুদ্ধ সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গও অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা কী ভাবে সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন ? অথচ, বুর্জোয়া নেতারা কিন্তু তাই চাইবেন! এ তো আর দোকানে দাঁড়িয়ে ডিম কেনা নয় যে, পকেট থেকে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে দোকানীকে ডিমের হুকুম দেওয়া!

তারপর, তত্ত্বের সাথে বাস্তবের আশমান-জমিন ফারাক। শহরে বসে যাঁরা তত্ত্ব নির্ণয় করেন, বাস্তবের মুখোমুখি তাঁরাই দিশেহারা হয়ে পড়েন। কাজেই শহরে তাত্ত্বিকদের বুলিতে গেরিলারা গুলি ছুঁড়বে না। পরিস্থিতি তাদের যে ধরণের যুদ্ধ করতে বলবে, তারা তারই সামিল হবে।

* ২৫শে এপ্রিল, ১৯৫৮।

(৩) এক নেতৃত্বের অভাব

এ পর্যন্ত নেতৃত্ব নিয়ে যে তত্ত্ব দাঁড় করানো হলো, তাতে কিন্তু একটি সমস্যা উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে : এক নেতৃত্বের অভাব [The lack of a single command]।

এ্যাকসান চালাবার জন্য একটা সাধারণ পরিকল্পনা তো চাই। সমস্ত উপাদান গুলিকে এখানে প্রধান আক্রমণ লক্ষ্যে উপস্থিত করা যাচ্ছে না। এক নেতৃত্বের অভাবে বিপ্লবী বাহিনীর দশা হয়েছে সেই গোলন্দাজের মতো, যাকে বলা হয় নি ঠিক কোন দিক তাক করে সে গোলা দাগতে শুরু করবে। ফলতঃ তার গোলাগুলি হয়তো বৃথাই শূণ্য ময়দানে এসে বার বার ফেটে পড়বে, শত্রুর এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না। পরিকল্পনাবিহীন যুদ্ধ প্রস্তুতি অর্থহীন। আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু যেখানে নির্দিষ্ট নয়, সেখানে ফায়ার বা ক্রস ফায়ার হাস্যকর। কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক-সামরিক নেতৃত্ব না থাকলে এ ধরণের শক্তি-অপচয় অনিবার্য। ফলহীন রক্তারক্তি মাত্র !

যে কোন ফ্রন্টের দু' ধরণের শক্তি রয়েছে—একটা হলো সশস্ত্র এবং অপরটি হলো রাজনৈতিক, যা আইনসম্মত এবং শান্তিপ্রিয়।

এই দুটো শক্তিকে কি ভাবে এক করা যায় ?

আরো কঠিন প্রশ্ন : কি উপায়ে গ্রামের গেরিলাদের সাথে শহরের আত্মগোপনকারী কর্মীদের যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব ?

এর উত্তর হলো : একমাত্র অতি শক্তিশালী দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কোন নেতার পক্ষে এই সেতু গড়ে তোলা সম্ভব। তাঁর সুচিন্তিত দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, যথার্থ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা এই দুই মেরুর শক্তিকে একই রেখায় মিলিয়ে দিতে পারে। অন্ততঃ, ধ্বংসের হাত থেকে এদের তিনি রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু সেই নেতৃত্ব যদি শহরের বুকেই দানা বেধে থাকে, তবে সমস্ত সম্ভাবনারই বিলুপ্তি অনিবার্য। নেতারা এটা জানেন এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁরা সেই আশঙ্কা করেন।

তবু চিরাচরিত অভ্যাসবশে সেই ভুলই করা হয় এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে অনেক প্রয়াসই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নতুন যে সংগ্রামের তাগিদ জেগেছে, তাকে অনুধাবন করতে গিয়ে এমন ভুল করলে চলবে না।.... .

সেই সব মুহূর্তগুলিকে নষ্ট করা আত্মহত্যার সামিল। লাতিন অ্যামেরিকার দেশগুলিতে বহু রাজনৈতিক নেতাই আজ শহর ছেড়ে পাহাড় বা জঙ্গলে গেলিরাদের ইউনিটগুলিতে মিলিত হবার তাগিদ অনুভব করেন ; অন্ততঃ পুলিশ ও মিলিটারীর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যও তাঁরা গেরিলা প্রথায় সংগ্রাম করবার কথা ভাবতে পারছেন। কিন্তু ভাবা এক, আর তাকে বাস্তবায়িত করা আর এক। হরেক রকম ভীতি ও সংকোচ তাঁদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা তখনো চেষ্টা করেন, শহরের মাটিকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে। ফলে অনেক মূল্যবান দিন কেটে যায়। প্রতিদিন তাঁরা যেন বাতাসে 'ক্যুপ' হবার খবর শুনতে পান, চোখের সামনে আলেয়ার আলো দেখে সূর্য বলে ভ্রম করেন। হরেক রকম ছল-ছুতো তো রয়েছেই।....তারপর একদিন উপস্থিত হবে সেই চূড়ান্ত লগ্ন, যখন সেই সব শহুরে নেতাদের আস্তানাগুলি পুলিশে ঘিরে ফেলবে, হঠাৎ শোনা যাবে পুলিশ-সুপারের কর্কশ কণ্ঠস্বর, নিরাপত্তার খাতিরে নাকি ব্যাপক তল্লাসি চলেছে, পালাবার পথ নেই, নেতার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, ভারী বুটের আওয়াজটা ক্রমশই এগিয়ে আসবে তাঁকে লক্ষ্য করে, তিনি আর অদৃশ্য হবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসতে হবে বাইরে, হাত তুলেই ছুটে আসতে হবে, রুদ্ধশ্বাসে বলতে হবেঃ ডোণ্ট স্যুট মি। আই সারেণ্ডার!

তারপর সেই অন্ধ কয়েদখানা। কিল-চড়-লাথি। হয়তো মারতে মারতে মেরেই ফেলা হবে। সাথে সাথে পুরনো নেতৃত্বও খতম।

পুরনো নেতৃত্ব মুছে গেলেও সংগ্রামের ইতি হবে না। নতুন আত্মগোপনকারী নেতার অভ্যুদয় ঘটবে। নতুন নেতা কিন্তু ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবেন। আগেকার কোন ফাইল-পত্র তাঁর হাতে না থাকায় কোন মৌল সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর দ্বিধা দেখা যাবে; অবশেষে তিনি গেরিলাদের উদ্দেশ্যেই রওনা দেবেন এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সুদিন আসবে—এই প্রত্যয় নিয়ে বিরাট ত্যাগ স্বীকারেও রাজি হবেন।

শহরে অনিয়ন্ত্রিত তৎপরতা—

এক নেতৃত্বের অভাবে সশস্ত্র সংগ্রামে কোন সুনির্দিষ্ট রণকৌশল অনুসরণ করা যায় না। আবার রণকৌশলের অভাবে কোন তৎপরতাই কার্যকরী হতে পারে না। গেরিলা গ্রুপগুলি শহর থেকে বিচ্ছিন্ন; শহরের লড়ুয়েরাও সিয়েরা-বনের গেরিলাদের অধীন নয়। ফলে শহরের অনিয়ন্ত্রিত তৎপরতায় এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, যার দ্বারা কোনদিন বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধানে চে লিখেছিলেন:

It is fundamental to recognise that a suburban guerrilla band can never spring up of its own accord........the suburban guerrilla will always be under the direct orders of chiefs located in another none. The function of this guerrilia band will not be to carry out independent actions but to coordinate its activities with over all strategic plans.

অবশ্যই নগরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হলে আসল বস্তু কিছুই লাভ করা যাবে না; রাজনৈতিক স্থিতাবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটবে মাত্র। কিন্তু যদি নগরে সেই তৎপরতা একটি মূল সংগ্রামের অংশ

হয়, তা হলে অবশ্যই এর একটা সামরিক মূল্য রয়েছে। হাজার হাজার শত্রু সৈন্যকে তারা বিভ্রান্ত করে ফেলে—পাহাড় বা জঙ্গলে গেরিলাদের ওপর আক্রমণের চাপ অনেক কমে যায়।

শত্রুকে পঙ্গু ক'রে রাখবার জন্য শহরের যোদ্ধারা অনেক কিছুই করতে পারে; তারা ক্রমান্বয়ে আক্রমণ চালাবে কল-কারখানার ওপর, উড়িয়ে দেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেতু, দুর্গম করে তুলবে সৈন্য চলাচলের পথকে, ধ্বংস করে ফেলবে ইলেকট্রিক জেনেরেটরগুলিকে, তেলের পাইপ ফাটিয়ে দেবে। শত্রু বাহিনীর চার ভাগের অন্ততঃ তিন ভাগ এই বিপর্যয়ের সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সরকার সব সময়ই আগে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে চাইবেন। গেরিলাদের কিন্তু এমন কোন সম্পত্তি নেই, যা তাদের রক্ষা করতে হবে। সরকারের মতো তাদের কোন বিরাট বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে না।...কাজেই সরকারী বাহিনীর শক্তি কখনো তার গাণিতিক সংখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কিউবার প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তার হাতে পঞ্চাশ হাজার নিয়মিত সৈন্য ছিল। কিন্তু তিনি মাত্র দশ হাজারকে নিযুক্ত রাখতে পেরেছিলেন গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য।

এ কারণেই ফিদেল কাস্ত্রো যুদ্ধের একটি কার্যকরী .ছক প্রথম দিন থেকেই এঁকে রেখেছিলেন, নিজের দূরদৃষ্টি নিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সান্টিয়েগো, হাভানা ইত্যাদি শহরে যুদ্ধরত '২৬শে জুলাই বাহিনী' পাহাড় বা জঙ্গলে আক্রমণাত্মক বাহিনীর চেয়ে সংখ্যায় ও সংহতিতে বেশি শক্তিশালী হবে। বাস্তবে হয়েওছিল তাই। গ্রামীণ গেরিলাদের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে এবং এদেরই ওপর গোটা সংগ্রামের নেতৃত্ব নির্ভর করে আছে। ১৯৫৭-এর জানুয়ারীতে ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা ফাস্তিনো পিরিজকে হাভানার সংগ্রাম সংগঠিত করতে বললেন। মাত্র কুড়িজন সহযোগী নিয়ে পিরিজ এই বিরাট কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে

পড়েন। পিরিজ হাভানা থেকে শত শত বন্দুক ও গোলা-বারুদ সিয়েরাতে পাঠাতে থাকেন। শহরে সৈন্যদের সাথে মুখোমুখি কোন যুদ্ধের মহড়া দিতে যাওয়া ভুল। পিরিজ কখনো তা করেন নি। তিনি এখানে চোরাগোপ্তা ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে সরকারকে বিব্রত করে রেখেছেন; সাথে সাথে সিয়েরার গেরিলাদের সাধ্যমত সাহায্য করেছেন।

হাভানায় যেমন কাজ করেছিলেন পিরিজ, সান্টিয়েগোতে তেমনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক পেইজ। পেইজও সান্টিয়েগোতে থেকে সমানে অস্ত্র পাঠিয়েছেন সিয়েরার গেরিলাদের কাছে। পেইজ মারা যাবার পর সেই সাহায্যধারা অক্ষুন্ন রাখেন নতুন নেতা সানকেজ। ১৯৫৭-এর ১১ই আগষ্ট ফিদেল তাই শহরের বন্ধুদের ডাক দিলেন: The most fitting slogan of the day ought to be; All guns, all bullets, all resources to the sierra···

একদিন শহর বা নগরে যে ধরণের সংগ্রাম চলছিল, ফিদেল কাস্ত্রো তাদের অসারতার কথা ঘোষণা করলেন। সাধারণতঃ সেখানকার ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ধর্মঘট, বন্ধ, শোভাযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থাকে অকেজো করে রাখবার পথকেই শ্রেয়ঃ মনে করেন। ১৯৫৮ এর এপ্রিলে কিউবার শহরগুলিতে এমন অনির্দিষ্টকাল ধরে বন্ধের ডাক দিলেন শহরবাসী নেতারা। ফিদেল সেদিন এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান নি, বরং একে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ধর্মঘট ব্যর্থ হলো। শহুরে নেতৃত্বে দেখা দিল হতাশা। ফিদেল কিন্তু এটাই হবে আশা করেছিলেন। তাই স্ট্রাইক শুরু হবার আগেই নাসিনকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন: যদি তিনি [বাতিস্তা] এই ধর্মঘটকে বানচাল করে দিতে সমর্থ হন, তবু কিন্তু আমরা অবস্থার হেরফের ঘটতে দেবো না। আমরা আমাদের পথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো এবং মাত্র ছয় মাসের মধ্যে বাতিস্তার অবস্থা শোচনীয় ক'রে তুলবো'

নগরের কাছে গেরিলা যুদ্ধ হলো একটা প্রতীক মাত্র, যা রাজধানীতে আর একটা 'ক্যুপ' ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু সিয়েরার সংগ্রামীদের কাছে গেরিলা যুদ্ধের তাৎপর্য অনেক বড়; তাদের কাছে এটা হলো রাজনৈতিক সমস্যার অবসানে একমাত্র সামরিক সমাধান। যে কোন ধর্মঘটকে খতম ক'রে ফেলবার মতো ক্ষমতা প্রায় অধিকাংশ শাসক শ্রেণীর হাতেই রয়েছে; কিন্তু সেই ক্ষমতা গেরিলা যুদ্ধের কাছে একেবারে অসহায়। এ ভাবেই শহর ও নগর যে বিপ্লবকে বিপন্ন করেছিল, সিয়েরার যোদ্ধারা তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। স্ট্রাইক ব্যর্থ হবার পর প্রমাণিত হলো, একমাত্র সিয়েরা পারবে বিপ্লবকে রক্ষা করতে। আরো যুক্তিপূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, এরপর নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়লো সিয়েরার গেরিলাদের ওপর। সেই সব দিনগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চে গুয়েভারা বলেছিলেন ঃ

"Else where Fidel states clearly : 'It is essential that a revolutionary know how to interpret reality'. Referring to the April strike, he explains that we were unable to interpret it at that moment and therefore we suffered a catastrophe. Why was the April strike called ? Why was there a series of controversies within the movement between what we called "the Sierra" and "the Llano". Which manifested themselves in diametrically opposed interpretations of the elements judged to be of prime importance in making decisions concerning the armed struggle ?

'The Sierra was ready to engage the army as often as neccessary, to win battle after battle,

capture arms, arriving one day at the total seizure of power, with the Rebel Army at its base. The 'Llano' favoured generalised armed struggle throughout the Country, culminating in a revolutionary general strike that would drive out the Batista dictatorship and establish a government of 'civilians'; the new army would then become a 'political".

'The clash between these positions was continuous and hardly facilitated the unity of command neccessary at such moments. The April strike was prepared and ordered by the 'Llano'; this was done with the agreement of the Sierra leadership, which did not consider itself able to prevent it [even though it had serious doubts concerning its outcome] and with the stated reservations of the P S P [Communist Party] which warned of the danger in time.'

'The revolutionary Commanders went to the "Llano" to help out, and it was thus that our unforgettable army Commander, Camilo Cienfuegos, made his first incursions in to the Bayamo area.'

'These differences go deeper than tactical divergences. The Rebel Army is already ideologically proletarian and thinks like a dispossessed class; the city remains petty bourgeois, contains future traitors among its leaders, and is very much influenced by the milien in which it develops.'*

* গুয়েভারা রচিত El Partido marxista-Leninista থেকে

গুয়েভারা ও ফিদেলের এই তত্ত্ব আধুনিক লাতিন অ্যামেরিকার ইতিহাস স্বীকার করে নিয়েছে। নাগরিক আন্দোলনের সাথে পাহাড়ের সংগ্রামের এই তফাৎ ও সংঘাত বার বার দেখা দিয়েছে এবং দিচ্ছে।

একনেতৃত্বে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে বহু দুর্বল গেরিলা সংগঠন বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে ওঠে। প্রতিক্রীয়াশীলদের সাথে গণবাহিনীর ঠোকাঠুকিতে এই গেরিলারা দুর্বলতর হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে শত্রু বাহিনী সব কয়টি সংগঠনের ওপর যুগপৎ আক্রমণ শুরু করবে না; তারা একটি পর একটিকে খতম করে যাবে। পেরুর অভিজ্ঞতা অন্ততঃ তাই বলে। ··

১৯৬২ সালের পর দেখা গেল, ভেনেজুয়েলায় হঠাৎ গেরিলা focos-দের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। কিন্তু আসলে এই বৃদ্ধি সম্পূর্ণ কৃত্রিম। গেরিলাদের আসল শক্তিবৃদ্ধি মোটেই ঘটলো না। তাদের আক্রমণাত্মক ক্ষমতারও কোন হের ফের হয়নি এতে।

আসল কারণ, একনেতৃত্বের অভাবে এখানে সেখানে গেরিলা সংগঠনগুলি এমন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছিল। কাজের কাজ কিছুই হয়নি; পরন্তু গেরিলারা আরো শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। হয়তো এই কারণেই শক্তিশালী শত্রুর প্রথম আক্রমণেই ভেনেজুয়েলার অধিকাংশ গেরিলাবাহিনী ছত্রাক্ষাণ হয়ে গিয়েছিল। মাত্র ফেলকন, লারা, ট্রইলো, ওরিন্টি ইত্যাদি গুটি কয়েক গেরিলা সংগঠন সেই আক্রমণের ধাক্কা সামলে উঠেছিল। কিন্তু তারাও আর গতি ও শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শ্রেণীসংগ্রামের ঝড় তুলতে পারেনি।

কিন্তু কিউবার বেলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্য এক দৃশ্য। এখানে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে গেরিলারা সংগঠিত হতে শুরু করে। সেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল সিয়েরা মেয়েস্ত্রাতে।

সিয়েরা তার বাহিনীকে পরে সুবিধার জন্য বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেয়। প্রথম দলে ছিল ১২০ থেকে ১৫০ জন যোদ্ধা। অন্যান্য দলগুলি প্রাথমিক ভাবে কাজ শুরু করেছিল ৪৫, ৫০ বা ৬০ জন গেরিলা নিয়ে [সিয়েরা-ফ্রন্টে প্রথম দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন চে গুয়েভারা, জুলাই, ১৯৫৭]। এই সব 'কলাম' গুলি নতুন নতুন ফ্রন্ট খুলবার কাজে লেগে গিয়েছিল। যদি কোন দল এমন এক দুর্গম জায়গায় গিয়ে কাজ শুরু করে, যেখান থেকে মূল ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা অসম্ভব, তবে সে নতুন আর একটি ফ্রন্ট খুলে উদ্যোগ-নেতৃত্ব অনুযায়ী কাজ শুরু করে দেবে। যেমন কমরেড রাউল ষাট জন গেরিলাকে সঙ্গে নিয়ে সিয়েরা ত্যাগ করেন এবং সুদূর উত্তরে ওরিয়েন্টিতে নয়া ফ্রন্ট খুললেন। ওরিয়েন্টির সাথে সিয়েরার ব্যবধান দুস্তর। বাধ্য হয়ে রাউল আরো কয়েকটি কলাম চারপাশে খুলে তাঁর আক্রমণাত্মক তৎপরতা শুরু করে দিলেন। ১৯৫৭-এর মার্চে কমরেড আলমিডা আর দল যোদ্ধা নিয়ে সান্টিয়েগো দ্য কিউবা অঞ্চলে তৃতীয় ফ্রন্ট খুলে বসলেন। ১৯৫৮-এর ১লা আগস্ট চে তাঁর গেরিলাদের নিয়ে সিয়েরা থেকে নেমে এলেন লাস ভিল্যাসে ; তাঁর পাশেই নব্বুই জন সেরা গেরিলা নিয়ে আর একটি ফ্রন্টের জন্ম দিলেন ক্যামিলো কিয়েনফিউগস। চে এবং ক্যামিলো হাতে হাত মিলিয়ে বাতিস্তার বাহিনীর ওপর ভয়াবহ আক্রমণ শুরু করে দিলেন। সেই আক্রমণের তোড়ে পূর্বদিকে বাতিস্তার মূল বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ছোট বড় নানা দিক থেকে এমন ফ্রন্ট খুলতে পারলে সুবিধে অনেক। কিন্তু এর সুফল পাওয়া যাবে তখনই, যখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে তারা তৎপরতা চালিয়ে যাবে। তবে আগেই বলা হয়েছে, পরিস্থিতি বুঝে tactical freedom প্রয়োগ করবার অধিকার প্রতিটি ফ্রন্টেরই রয়েছে। তাঁদের এই স্বাধীনতা অনুযায়ী

যুদ্ধ পরিচালনার কতগুলি সাধারণ নিয়মও রয়েছে; যেমন, শত্রুর ঘাঁটির ওপর প্রথমেই আক্রমণ না চালিয়ে চলমান একদল সেনার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালানো অনেক বেশী কার্যকর। হয়তো একদল সৈন্য একটি শিবির থেকে অন্য এক শিবিরে হেঁটে চলেছে, সেই সময় গেরিলাদের উচিত পথের মধ্যে তাদের গতিরোধ করা এবং শিকারী চিতার মতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। শত্রুর রসদ বা গোলা-বারুদের ভাণ্ডারের ওপর ক্রমান্বয়ে আক্রমণ শানাতে হবে। শত্রু বন্দুকে গুলি ভরবার আগেই তাকে আক্রমণ করা গেরিলা যুদ্ধের রীতি। চোরা গোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর ঘাড়ে ক্রমশই বোঝা চাপিয়ে দিতে হবে। এই বোঝা হলো তাদের আহত সৈনিকরা। এই আহতদের বয়ে নেবার সময় তারা এত বেশি বিব্রত হয়ে পড়ে যে, মুষ্টিমেয় গেরিলারাই তাদের বিধ্বস্ত করতে পারে। শত্রুর চলা-ফেরার পথ যতটা সম্ভব ইলেকট্রিক মাইনে কণ্টকাকীর্ণ করে রাখতে হবে। শত্রুকে জানে না মেরে তার হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেবার ওপরই বেশি জোর দেওয়া উচিত। চকিতে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে বিস্ময় ও ত্রাসের মধ্যে ফেলতে হবে। এ ধরণের আক্রমণ যত চলবে, শত্রু ততই তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে, প্রায় যেন এক ভৌতিক প্রতিতি তাদের মনের ওপর বার বার ছায়া ফেলবে। আবার গেরিলাদের সুন্দর মানবিক ব্যবহার তাদের চিন্তা জগতেও দ্রুত পরিবর্তন আনবে। যেমন, গেরিলারা বন্দীদের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করেনা, নিজেদের খাবার তাদের সাথে সমান ভাবে ভাগ করে খায়, আহত বন্দীকে সাধ্যানুসারে চিকিৎসা করে ইত্যাদি।

ঠিক এ ভাবেই ধীরে ধীরে গেরিলা-নেতারা নিজেদের কর্তব্য বুঝতে পারেন। তখন অনায়াসেই এক একটি ফ্রন্টের দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দেওয়া যায় এবং এ কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে, তাঁরা যে ভাবে দলকে পরিচালনা করবেন তা কখনো কেন্দ্রীয়

নেতৃত্বের পরিপন্থী হবে না। তাঁরা প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত। একই সংগ্রামী স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। আদর্শের বন্ধনে তাঁরা এক, অভিন্ন। They are all trained together, in the same school, which imulates in them a common spirit, tactical rules, and a step-by-step political and military plan of action.

যদি কোন ফ্রণ্ট গঠনে দুর্বলতা দেখা দিতো ফিদেল কাস্ত্রো সাথে সাথে সেই ফ্রণ্টকে সিয়েরার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দ্রুত এসে যোগ দিতে নির্দেশ দিতেন। ১৯৫৭ এর মে মাসে মিরান্দা আখ-চাষের এলাকায় এরকমই এক দুর্বল ফ্রণ্ট সরকারী বাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত হলে, কাস্ত্রো আরো সচেতন হয়ে ওঠেন। গুয়েভারা তাঁর ডায়েরিতে সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন:

We had to demonstrate that we were alive, because we had been given some hard knocks by the 'Llano'; The arms allocated to the opening of another front beginning at the Miranda sugar central fell in to the hand of the police, who were helding several valuable leaders as prisoners, among them Faustino Perez. Fidel was opposed to dividing the forces but he gave in to pressure exerted by the 'Llano'. Thereafter the correctness of his thesis was proved, and we devoted ourselves to strengthing the Sierra Maestra as the first step towards the expansion of the guerrilla army···

কোন রাজনৈতিক সংগঠন গণযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে, এমন বড় একটা এখানে চোখে পড়েনা। লাতিন অ্যামেরিকার অধিকাংশ

রাজনৈতিক দলগুলিই গেরিলা যুদ্ধের তপ্ততাকে সভয়ে এড়িয়ে গেছে। কেবলমাত্র বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী-সচেতন মানুষের দল এই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবীরাই এমন দায়িত্ব নিতে সক্ষম। কোন একটি রাজনৈতিক দলের নেতারা হয়তো কূটনীতিক পর্যায়ে কিছু কাজ করতে পারেন, কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পাবে। যতদিন পর্যন্ত আলোচনা ও আপোষের পক্ষ খোলা আছে, ততদিন তাঁদের তৎপরতা লক্ষনীয়। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়ে গেলে তাঁদের ভূমিকা ম্লান হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, কেন তাঁদের এই অক্ষমতা? নৈতিক বলের অভাব? সংগ্রামী যোদ্ধার কিন্তু নৈতিক বল সব সময়ই উঁচু পর্দায় বাধা। যে সব দেশে বিপ্লব সফল হয়েছে, সেই সব দেশের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে আদর্শবাদী, সাহসী, বিপ্লবী, যোদ্ধা, কমিউনিস্ট কমরেডদের জন্যই তাদের যুদ্ধ জয় সম্ভব হয়েছে। কিন্তু পার্টির দুর্বল নেতৃত্বের জন্য আবার অনেক দেশে এই সব সাহসী কমরেডের দল খতম হয়ে গেছেন। তালিকা খুঁজে দেখুন, অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেও তাঁরা বিজয়ী হননি। হয় মারা গেছেন, না হয় বুর্জোয়াদের জেলে পচে মরছেন। কিন্তু হায়! ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; আর গোড়ায় গলদ থাকলে শত শহীদের রক্তও ব্যর্থ হয়। যখন এই শহীদদের তালিকা দীর্ঘ হয়, এবং যখন সাহসিকতা দেখাতে গেলেই শহীদ হয়ে যাবার সম্ভাবনা, তখন বুঝতে হবে, কোথাও কোন বিরাট ভুল রয়ে গেছে! তখন জীবিতদের নৈতিক দায়িত্ব হলো সেই গলদ খুঁজে বের করা এবং নিহত অথবা বন্দী কমরেডদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।···

এর পর রেজি দ্যব্রে একের পর এক কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন—প্রতিটি প্রশ্নই বর্তমান যুগের পটভূমিতে অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ ; এবং তিনি নিজেই প্রশ্নগুলির জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম প্রশ্ন হলোঃ কার শক্তি বৃদ্ধি আজ বেশি প্রয়োজন—পার্টির বা গণবাহিনীর প্রাথমিক প্রকাশ গেরিলাদের? চূড়ান্ত সংযোগ কোনটি? কোথায় মূল কার্যধারা পরিচালিত হওয়া উচিত?

[Which should be strengthened today, the Party or the guerrillas, embryo of the peoples army? which is the decisive link? where should the principal effort be made?]

লাতিন অ্যামেরিকার দেশে দেশে গেরিলা যুদ্ধ দানা বেধেছে। সাথে সাথে দেখা দিয়েছে এই সমস্ত প্রশ্ন। প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজতে গিয়ে কিন্তু সংগ্রামরত জনতা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।

আগামীকাল অপরাপর জাতির সংগ্রামী যোদ্ধারা তাঁদের এই মতামতের মুখোমুখি হবেন। প্রশ্নগুলি সত্যই যেন তাঁদের উভয় সংকটে ফেলেছে।

মার্কসবাদের ইতিহাসে প্রশ্নগুলি সাড়া তুলেছে এবং দুনিয়ার হাল-হকিকতেও এদের গুরুত্ব অসাধারণ। আর জবাবও এমন দিতে হবে, যা প্রায় অপরিবর্তনীয় থাকবে। হঁা, উত্তর হলো এই যে, পার্টিকেই আগে শক্তিশালী করতে হবে; কারণ পার্টিই তো গণবাহিনীর জন্মদাতা। একমাত্র মেহনতী জনতার পার্টিই প্রকৃত গণবাহিনী গঠন করতে পারে, যে গণবাহিনী মেহনতী জনতার জন্য ক্ষমতা দখল করবে।

প্রচলিত তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠাঃ

প্রচলিত তত্ত্ব বলে যে, শত্রু বাহিনী ধ্বংস করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; আসল লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে এসে গেলেই সামাজিক পরিবর্তনও ত্বরান্বিত করা যাবে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তি বিশেষ কতকগুলি গাঁথুনির ওপর নির্ভরশীল,—যেমন রাজনৈতিক পলিটব্যুরো,

আইন বিভাগ, সংবিধান্ ইত্যাদি। এ গুলির অধিকাংশই পীড়ন চালাতে সরাসরি কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেয় না। বর্তমান রাজনৈতিক শক্তি খতম করতে হলে নির্যাতিত জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাদের হাতেই তুলে দিতে হবে অস্ত্র, তারাই পরিচালনা করবে বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ।

এখন আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এই শ্রেণীকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেয় একটি রাজনৈতিক দলই, কোন সশস্ত্র সামরিক সংগঠন নয়! প্রলেতারিয়েতদের সেই দলই প্রতিনিধিত্ব করে, যে দল পরিষ্কারভাবে তার শ্রেণীচরিত্র প্রকাশ করতে পেরেছে। এবং এই শ্রেণীচরিত্র নির্ণয়ের যথার্থ দর্শন হলো মার্কস্‌বাদ ও লেনিনবাদ। একমাত্র এই দলের নেতৃত্বই বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণী স্বার্থকে রক্ষা করতে পারে। সমাজের যাবতীয় জটিলতা সম্পর্কে তাদের থাকবে বিজ্ঞাননিষ্ঠ ধারণা—তামাম দুনিয়াজোড়া শোষিতের সংগ্রামকে বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়া তাদের দায়িত্ব। এমন সংগ্রাম চলেছে নানা স্তরে; সশস্ত্র বিপ্লবী উত্থান তার একটা অনিবার্য ফলশ্রুতি মাত্র,—গণবাহিনী বুর্জোয়া সমাজকে চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্য এই পথ বেছে নেয়। মেহনতী জনতার পার্টি স্থির করবে কী তাদের শ্লোগান হবে, কোন লক্ষ্যে তাদের পৌঁছতে হবে এবং সময় বিশেষে কী রকম নীতি অনুসরণ করতে হবে! গণবাহিনী তাদের একটা হাতিয়ার হবে মাত্র। গণবাহিনীকে দলে স্থান দেওয়া হয় উদ্দেশ্য-জয়ের প্রধান উপায় হিসাবে। এই হাতিয়ারটি না থাকলে রাষ্ট্রশক্তি দখল করা সম্ভব নয়।

ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা

আমাদের যুগে যদি কোন বৈপ্লবিক সংগ্রাম জয়ী হয়, আমরা উৎসাহের সাথে এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য খুঁজতে থাকি। তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে আমরা কতকগুলি নীতিকে অনুসরণ করি।

এই নীতি আবার বিপ্লবী সংগ্রামীদের পরিষ্কার দুটো দলে ভাগ করে ফেলে—রাজনৈতিক ভ্যানগার্ড এবং সামরিক জনতা। আমরা আমাদের বর্ক্তব্য রাখি: দ্বিতীয় দলের ওপর প্রথম দলের রয়েছে নিরঙ্কুশ আধিপত্য। ১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবের কথাই ধরা যাক না কেন। বলশেভিক রেডগার্ডরা পার্টির মিলিটারী কমিটির নির্দেশ অনুসারে আক্রমণ শানাতো। আবার সেই মিলিটারী কমিটি ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে। কেন্দ্রীয় কমিটি মিলিটারী কমিটিকে যে নির্দেশ দিতো, মিলিটারী কমিটি সেই নির্দেশ অনুযায়ীই রেডগার্ডদের পরিচালনা করতো।

কিন্তু এটাই চূড়ান্ত নয়। 'অক্টোবর বিপ্লব' আমাদের সামনে যথার্থ নিঃসন্দিগ্ধ পথ তুলে ধরে না। কারণ, এটা ছিল শহর এলাকায় শ্রমিকদের বিদ্রোহ; একে গণযুদ্ধ বলা যায় না। তা হলে আমাদের এমন সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করতে হবে, যে সব দেশে গ্রাম থেকে জেগে ওঠা গণযুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। আমাদের সামনে দুটো দৃষ্টান্ত জ্বল জ্বল করছে,—চীন এবং ভিয়েতনাম।

চৈনিক বিপ্লবের ধারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বয়ং মাও সে-তুং বলেছিলেন: Politics directs the Gun.

কথাটা আক্ষরিক সত্যি। পার্টি এখানে আর্মিকে যথার্থ নেতৃত্ব দিয়েছিল।

আর ভিয়েতনামের গণযুদ্ধ সম্পর্কে গেরিলা নেতা গিয়াপ লিখলেন:

The first fundamental principle in the building of our army is the imperative necessity of placing the army under Party leadership, of constantly strengthening Party Leadership. The party is the

founder, the organiser, and the educator of the army. Only its exclusive leadership can permit the army to hew to a class line, to maintain its political Orientation, and to fulfil its revolutionary tasks.*

ভিয়েতনামের বেলায় এই তত্ত্ব একেবারে আক্ষরিক অর্থে সত্য। গণবাহিনীর সদস্যরা এখানে নির্বাচিত হন রাজনৈতিক দল থেকেই। ইউনিট কম্যাণ্ডাররা তাঁদের কাজের জন্য সরাসরি পার্টি কমিটির কাছে দায়ী থাকেন। পার্টি এখানে মূল 'সেল' [cell]। যদি এই সেল দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে গোটা সংগ্রামই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। গিয়াপের কথায়ঃ If the cell is weak, the Company is weak.

চীনের বেলায় নিয়মের সামান্য হের ফের ঘটেছে। এখানে পার্টি কমিটি গণবাহিনীর রেজিমেণ্টগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। সাত থেকে নয় জন সদস্য নিয়ে এমন এক একটি কমিটি গড়ে ওঠে। এক একজন রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার পদমর্যাদায় এক একজন পার্টি কমিশারের সমপর্যায়ভুক্ত। পার্টি কমিটি আবার তার অধীনে কতকগুলি ইউনিট তৈরী করে। ব্যাটেলিয়ন এবং কোম্পানিগুলির কোন পার্টি কমিটি নেই; কিন্তু তাদের মাথার ওপর রয়েছেন এক একজন রাজনৈতিক নেতা। গণবাহিনী আগাগোড়া এই একই নিয়মে গঠিত। ধনতান্ত্রিক দেশের সেনাবাহিনীর মতো এখানকার জেনারেল স্টাফ কাজ অনুযায়ী চার-পাঁচ ভাগে বিভক্ত নয়; কিন্তু সামরিক ও রাজনৈতিক পরিচালনার জন্য তাঁরা পরিষ্কার দুটো দলে বিভক্ত, যদিও তাঁদের পদমর্যাদা একই।

ব্যাপারটা আরো প্রাঞ্জল করবার জন্য আমরা একটা প্রতীকি উদাহরণ টানতে পারি। প্রতীকটি ব্যবহার করা হচ্ছে কতকগুলি

* People's War, People's Army. [Page 123]

নামের মাধ্যমে ; তাঁদের একজন রাজনৈতিক নেতা, অপরজন সেই রাজনীতি-নির্ভর সশস্ত্র বাহিনীর নেতা। যেমন, চৈনিক বিপ্লবের সময় এবং লং মার্চের সময় মাও সে-তুং [রাজনৈতিক] এবং মার্শাল চু তে [সামরিক]-এর ভূমিকা। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হো-চি-মিন্ [রাজনৈতিক] এবং গিয়াপ [সামাজিক]-এর নেতৃত্ব। সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মিলীত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বার সময় লেনিন [রাজনৈতিক] এবং ট্রটস্কি [সামরিক] র কৌশল।

কিন্তু কিউবার বেলায় এই রাজনৈতিক ও সামরিক—দ্বি-বিধ নেতৃত্বই এসে সংঘবদ্ধ হয় একজনমাত্র মানুষের হাতে—তিনি ফিদেল কাস্ত্রো। এটা কি একটা বিরল ঘটনা মাত্র? এর কি কোন তাৎপর্য নেই? অথবা, এ ঘটনা কি এক ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে ইঙ্গিত করছে না? এটা কি নেহাৎ ব্যতিক্রম না, আর এক মৌলিক তত্ত্বের সন্ধান দিচ্ছে? লাতিন অ্যামেরিকার প্রবহমান ইতিহাসে এর কি তাৎপর্য?

আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে, সমাধানে আসবার আগে সব কিছুই বিবেচনা করে দেখা দরকার। সম্প্রতি কাস্ত্রো তাঁর সমালোচকদের জবাব দিয়েছেন ঃ

I am accused of heresy. It is said that I am a heretic within the camp of Marxism-Leninism, Hmm! It is amusing that so-called Marxist organisations, which fight like cats and dogs in their dispute over possession of revolutionary truth, accuse us of wanting to apply the Cuban formula mechanically. They reproach us with a lack of understanding of the Party's role ; they reproach us as heretics within the camp at Marxism-Leninism....

ফিদেলের তপ্ত কণ্ঠস্বরে আবার তাই ধ্বনিত হলো : Who will make the revolution in Latin America? Who? The people, the revolutionaries, with or without a party.

সাফ জবাব। লাতিন অ্যামেরিকায় বিপ্লবের বহ্নি জ্বালাবার জন্য কোন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন হবে না। জনগণ—বিপ্লবী জনগণ—বিপ্লবের লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে তুলবে। ফিদেল সরাসরি বললেন, গণবাহিনী ছাড়া কখনো বিপ্লব হয় না ; কিন্তু সেই গণবাহিনীকে যে মার্কসিষ্ট-লেনিনিষ্ট দলের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই! যারা বিপ্লব করতে চায়, তাদের সমবেতভাবে অস্ত্র ধরবার অধিকার আছে! এই সমস্ত পার্টির খাতায় নাম লেখাবার প্রয়োজন তাদের নেই।

একটা প্রচলিত তত্ত্ব, একটা প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে এমন সোচ্চার হয়ে উঠবার মতো বুকের পাটা ফিদেল কাস্ত্রোর আছে। ফিদেলের এই দীপ্ত ঘোষণায় সচকিত আমাদের মনে আবার কতকগুলি প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো। প্রথম প্রশ্ন : কী ভাবে আমরা বলতে পারি যে, পার্টি-নেতৃত্ব ছাড়াই বিপ্লব সম্ভব? প্রথম প্রশ্নের সাথে সাথে আসছে দ্বিতীয় প্রশ্নটিও : কী ভাবে তবে ঐতিহাসিক ভ্যানগার্ড গঠিত হবে?

এটা কোন দলের প্রশ্ন নয়, এটা হলো ইতিহাসের জিজ্ঞাসা। আর ইতিহাসের জিজ্ঞাসা বলেই আমাদের আবার তাকাতে হচ্ছে পিছনের দিকে। একটি রাজনৈতিক দলের চরিত্র বুঝতে হলে তার জন্মলগ্নের ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। কোন পথে সেই দলের প্রসার ঘটেছিল, তাও পর্যালোচনার বিষয়। দেখতে হবে, মজলুন জনগণের কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে এই দল। এমন আলোচনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য আবার আমরা চীন ও ভিয়েতনামকে দলে টেনে আনছি। আমরা দেখবো, কোন

ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পার্টির সাথে গেরিলাদের সম্পর্কে সেই চিরাচরিত ফর্মুলাটিই কার্যকরী হয়েছিল।

প্রথমতঃ, চাইনিস্ এবং ভিয়েতনামিস্ পার্টিগুলি প্রথম থেকেই একটি বৈপ্লবিক শক্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। চৈনিক দলের জন্ম ১৯২১ সনে। বৎসরটি নানা কারণে স্মরণীয়। ঐ সময়ই সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে বুর্জোয়া বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে; যে বিপ্লবে কুয়েংমিটাং পার্টির ভূমিকাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। সাম্যবাদীরাও সেই বিপ্লবকে অস্বীকার করেন নি। পার্টি গঠনের প্রথম দিন থেকেই তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে এসেছেন। এমন কি মিঃ জোফে ও বরোদিনের নেতৃত্বে একদল রুশ সমর-বিশেষজ্ঞ চীনে এলেন পার্টি-কমরেডদের অস্ত্র-বিদ্যায় তালিম দিতে। পোহামপোর মিলিটারী এ্যাকাডেমি তাঁদেরই উদ্যোগে খোলা হয়েছিল। এই এ্যাকাডেমিতে চীনা কমিউনিস্ট অফিসাররা উন্নত সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন।

এর ঠিক তিন বছর পরে চীনে আগুন জ্বললো। প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের [১৯২৪—২৭] সামিল হলো সেই দেশ। গণবিদ্রোহ দেখা দিল শহরে, গ্রামে নয়। সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা নিলো ক্যান্টন শহর—গোটা সরকারী প্রশাসনই সেখানে অচল। কিন্তু বিরাট গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা সত্বেও বিপ্লব মার খাচ্ছিলো। সেই বিপর্যয় মুহূর্তে মাও সে-তুং এক নতুন ধরণের নেতৃত্ব দিলেন। তিনি বললেন: শহর ছেড়ে গ্রামে যাও, গ্রামের বুকে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলো এবং কুয়েংমিটাংদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করো।

ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় ১৯৩০ সালে। এর ঠিক পূর্বক্ষণেই মেকং-এর নিম্ন এলাকায় কৃষক-বিদ্রোহ অতি নির্মম ভাবে দমিত হয়েছে। পার্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হো-চি-মিন্

বললেন : The only path to liberation is that of armed mass struggle.

গিয়াপ বললেন : Our party came into being when the Vietnamese revolutionary movement was at its peak. From the beginning it led the peasants, encouraged them to rise up and establish Soviet power. Thus, at an early stage, it became aware of the problems of revolutionary power and of armed struggle.

সংক্ষেপে বলা চলে, চীন এবং ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি জন্মলগ্ন মুহূর্তেই গণযুদ্ধের ডাক দিয়েছিল, গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলবার ওপর জোর দিয়েছিল এবং দিনের পব দিন জনগণের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা আরো নিবিড় করে তুলেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক কতকগুলি ঘটনা এই দুই দেশের ওপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করলো। পার্টি তথা তামাম জনতা তখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছে। এই সাম্রাজ্যবাদ বিদেশী হিংস্র নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ। ১৯৩৭-এ জাপান চীনকে আক্রমণ করেছে, —গোটা জাতি সেই হানাদারদের বিরুদ্ধে মরণপন সংগ্রামে নেমে পড়লো। ১৯৩৯ সালে ঐ জাপ সাম্রাজ্যবাদই তার ধারালো দাঁত বসিয়েছে ভিয়েতনামের বুকে,—ভিয়েতনামবাসীরা তীব্র আক্রমণে সেই সাম্রাজ্যবাদকে দূর করে দিলো; কিন্তু জাপানীদের ছেঁড়া চটি পরে ১৯৪৫-এ আসরে এসে ঢুকলো ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ; ভিয়েতনামবাসীরা তার বিরুদ্ধেও সংগ্রামের ধারা অব্যাহত রাখলো।

এই সব ঘটনায় দেখা গেল, চীন ও ভিয়েতনামে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ চলছিল, তাই ক্রমশঃ রূপ নিলো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধে। শ্রেণীসংগ্রাম পরিণত হলো স্বদেশ প্রেমিকযুদ্ধে। বলা হলো, জাতীয় স্বাধীনতার সাথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জাতীয় স্বাধীনতা না এলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই দুই দেশের পার্টিই প্রমাণ করলো, কী যুদ্ধে, কী রাষ্ট্র-বিপ্লবে তাদের নেতৃত্ব অনস্বীকার্য। দেশের তামাম সংগ্রামী জনতা সেই দলের পতাকার নীচে সমবেত হলো।

তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গ্রামে গ্রামে গেরিলারা শক্তি সংহত করতে থাকে। শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা এসে যুক্ত হয় লালফৌজ [চীনে] এবং ভিয়েতমিন্‌দের [ভিয়েতনামে] সাথে সংগ্রামের তাগিদে শ্রমিক-কৃষক হাতে হাত মেলায় এবং সেই মিলনমঞ্চটি হলো কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং এই সংগ্রামের ও দলের নেতারা চিরাচরিত ফ্যাশানে নির্বাচিত হন না। ভয়াবহ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁরা নিজেদের নেতৃত্ব-শক্তিকে প্রমাণ করেন। এই সব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বরাই ইতিহাস সৃষ্টি করে থাকেন।

দ্যব্রের নিজের কথায়—Function makes the functionary, but paradoxically only historic individuals 'make history.'

খুব একটা বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়েও বলতে পারি, লাতিন অ্যামেরিকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টিকে অনুরূপ ভূমিকা নেবার সুযোগ দেয় নি। তাদের জন্মের কারণ, বৃদ্ধির কারণ এবং নির্যাতিত জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন....কিন্তু কিউবার বিপ্লব এতকালের প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় ধারণার মূল ধরে দারুণ নাড়া দিয়েছে। একটা বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হলে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির দরকার। এমনকি শান্তির সময়ও এই প্রস্তুতি চলবে। আর এই সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরণের নেতৃত্ব,

---

* 'ভিয়েতমিন্' শব্দের অর্থ মুক্তিফৌজ। কিন্তু মার্কিনী ভাষ্যকাররা এদের নামকে বিকৃত ক'রে বলে থাকেন 'ভিয়েত কঙ'। আশ্চর্যের কথা, আমরা অনেকেই সেই 'ভিয়েত কঙ' নামটিই ব্যবহার করে থাকি!

বিশেষ ধরণের সংগঠন, বিশেষ ধরণের কায়দা-কানুন। সকলেই জানেন, গেরিলা যুদ্ধের কায়দাকে বাইরে থেকে ধরা যায় না; এর আসল শক্তি অন্তঃর্নিহিত। এবং এর নেতৃত্ব কখনো ঝুঁকি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে না। যদি কোন দেশে এমন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তবে সেই দেশের অধিকাংশ সংগঠনের নেতারাই শহর ও নগর ছেড়ে যোগ দেবেন গেরিলা বাহিনীর সাথে। এ ছাড়া উপায়ও নেই। বাঁচবার তাগিদেই তাঁরা গেরিলাদের সাথে যুক্ত হবেন। কিন্তু যোগ দিলেও তাঁদের যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ। হয়তো তাঁদের অনেকেই গেরিলাদের কঠিন জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন না। গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হলে যে শারীরিক সক্ষমতা দরকার, তাঁদের মতো শহুরে মানুষের সেটা না থাকাই স্বাভাবিক। কিউবার ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয়, চূড়ান্ত সংগ্রামের মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা ক্রমশই গৌণ হয়ে পড়ে। এমনকি সাময়িক কালের জন্য পার্টির আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ স্তব্ধ হয়ে যাওয়াটা অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাই বলে পার্টি ক্যাডাররা নিষ্ক্রিয় হয় পড়বেন না। তাঁদের সক্ষমতাকে ছোট ক'রে দেখা উচিত নয়। তাঁরাও দলে দলে গেরিলা যুদ্ধের সামিল হবেন। এত দিনের পঠিত ও উপলব্ধ আদর্শকে তাঁরা বাস্তবায়িত করবার সুযোগ পাবেন। বাতিস্তার বিরুদ্ধে সমবেত এই সব পার্টি কমরেডদের উদ্দেশ্যে চে গুয়েভারা তাদের এতদিনের ভ্রান্তি সম্পর্কে বলেছিলেন:

You are capable of creating Cadres who can endure torture and imprisonment in silence but not of training cadres who can capture a machine-gun nest.

লাতিন অ্যামেরিকার ক্ষেত্রে এটা সত্যই এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। এখানকার দলগুলি প্রায়ই মার্কসবাদের মুখোশ পরে শ্রেণী-সচেতন

হয় না। তাদের ক্যাডারদের তারা অস্ত্র ধরতে শেখায় না। অতএব, চীন বা ভিয়েতনামের বেলায় যেটা সত্য, লাতিন অ্যামেরিকার বেলায় ঠিক তার উল্টো। ওখানে দলের ওপরই বেশি জোর দেওয়া বাঞ্ছনীয়; আর এখানে দলকে বাদ দিয়ে গণবাহিনীকেই মদত দেওয়া কর্তব্য।

ছাত্রের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো—কি ক'রে একটি সেনামুখ রাজনৈতিক দল গঠিত হতে পারে? বর্তমান পরিস্থিতিতে লাতিন অ্যামেরিকার কোন দল কি গণবাহিনী গঠনে সক্ষম হবে? কার মধ্যে কে থাকবে?

[How is a vanguard party formed? Can the party, under existing Latin American conditions, create the Popular army? Which is the nucleus of which?]

লাতিন অ্যামেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের জন্মক্ষণ থেকেই পরিস্থিতির সামাল না দিতে পেরে ভুল নীতি অনুসরণ করে এসেছে। সেই ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগে থেকেই। নিজেরাই নিজেদের পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। ঘটনার সংঘাতে কেঁপে উঠেছে, তৎপরতার সময়ে কেমন স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছে, পার্টির শিরা-উপশিরায় বয়ে চলেছে বদরক্তের ধারা—শুকনো আর বুড়োটে ধারণাকে সাপটে ধরাই তাদের নীতি।

কিন্তু দেখুন, ঐ পার্টিগুলিই তো শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ার। যেখানে এই হাতিয়ারে মরচে ধরে গেছে, সেখানে কী করণীয়? সংগ্রামের ওপর ঘেন্না জন্মে যাবে? ইতিহাসের গতি রুদ্ধ হয়ে পড়বে? শ্রেণী সংগ্রাম কি মরা নদীর মতো শুকিয়ে যাবে? না, নতুন হাতিয়ারের সন্ধান করতে হবে?

এইগুলি প্রশ্নই নয়। শ্রেণী সংগ্রাম, যা ইতিহাসের স্রোত, তা

কোনদিনই বন্ধ হতে পারে না। এমন কোন শক্তি নেই যা তার গতি রোধ করতে পারে। লাতিন অ্যামেরিকার বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রেণী সংগ্রাম মার খেতে পারে, তার অগ্রগতির পথে বিরাট বিরাট বাধার সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তার অভিব্যক্তি অনিবার্য। জনগণ নিজেরাই বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তুলবে।

আমরা বর্তমানে অনেক আশ্চর্য নতুন নতুন ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছি। চে গুয়েভারা লিখেছেন, গেরিলা সংগ্রাম নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না। অথবা, এটা একটা গৌরবময় রোমাঞ্চকর অভিযান নয়। এটা শুধু এক বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছে যাবার উপায়। সেই লক্ষ্য হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় ক'রে নেওয়া। এ ছাড়াও, গেরিলা বাহিনী আরো কতকগুলি উদ্দেশ্য সফল ক'রে থাকে। যেমন, গেরিলারা বুর্জোয়া সরকারের ওপর দারুন চাপ সৃষ্টি করে; এটাই হচ্ছে হাতের ট্রাম্প কার্ড—খেলার গতি অনুকূলে টেনে আনবার প্রধান সহায়। আবার শোধনবাদী পার্টির দলও এই সময় চেষ্টা করে, বিজয়ী গেরিলাদের পিঠ চাপড়ে তাদের নেতৃত্ব কব্জায় আনতে. তারাও বুঝতে পারে, গেরিলারাই হচ্ছে হাতের ট্রাম্প কার্ড! কিন্তু ততদিনে ঘটনা অনেকদূর এগিয়ে গেছে : গেরিলারা ঐ সমস্ত নেতাদের স্তোকবাক্যে কর্ণপাত করবে না,—তারা তখন নিজেরাই নিজেদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গঠন করে ফেলেছে।

তবে মনে রাখতে হবে, গেরিলারা নিজেরাই কখনো কোন নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয় না। বরং তারা নিজেদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলাদলি থাকলে, তা মুছে ফেলবার চেষ্টা করবে। সমস্ত উপাদানগুলিকে নিবিড় ঐক্য বাধনে এনে সংগ্রামে বিজয়ী হওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। কাজেই গেরিলারা যখন একটার পর একটা যুদ্ধে সফল হতে থাকে, দেশ জোড়া হরেক দলের রাজনৈতিক

কচকচানির উত্তাপ ততই স্তিমিত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে মানুষ তাদের মুক্তিফৌজকেই নিজেদের পার্টি বলে মনে করবে। তখন essentially the Party is the army.

কিউবার বিপ্লব কি এই আপাত বিরোধী সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে নি?

অনেকেই ভয়জনিত অবসাদে বললেম,—পার্টি, যা হলো ক্ষমতা দখলের প্রধান হাতিয়ার, সেটাই কিনা গড়ে উঠলো ক্ষমতা জয় করবার পর! কিন্তু না, পার্টি সংগ্রাম চলবার সময়ও ছিল; ছিল ভ্রূণ অবস্থায়—ঐ বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যেই! গেরিলা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৫৯ সালে এক অঘোষিত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। একজন বিদেশী সাংবাদিক এক সময় সংগ্রামী কিউবায় ঢুকে বড় হতবাক হয়ে পড়েছিলেন! তিনি দেখলেন, কিউবার বহু কমিউনিস্ট নেতাই যুদ্ধের ইউনিফর্ম পরেছেন! তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন, ইউনিফর্ম গায়ে চাপিয়ে আর কোমরে পিস্তল লটকে এঁরা লোক দেখানো বিপ্লব করছেন! এঁরা সত্যই সহানুভূতির পাত্র! কিন্তু আসলে সেই বিদেশী সাংবাদিক ভদ্রলোকই করুণার পাত্রঃ যুগের গতিকে তিনি ধরতে পারলেন না—তাঁর চোখের সামনে বিপ্লব দ্রুত পরিণত হচ্ছিলো! সেই মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারেন নি, এটাই হচ্ছে অ্যামেরিকার ভবিষ্যৎ ইতিহাস।

গিয়াপ-নীতি অনুসারে ভিয়েতনামে যেমন পার্টির মধ্যেই ছিল বাহিনী, কিউবার ক্ষেত্রে ঘটলো ঠিক তার উল্টো। অথচ, বিপ্লব কিউবাতেও সফল হয়েছে। তামাম দুনিয়ায় এতকালের প্রতিষ্ঠিত মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের ওপর আর এক ভাবনার জন্ম দিয়েছে। অন্ততঃ লাতিন অ্যামেরিকার মুক্তিকামী দেশগুলির সামনে কিউবাই যথার্থ দৃষ্টান্ত! এখানকার শোষিত জনগণের তকদিরে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে কিউবার পথই অনুসরণ করা উচিত।

দুনিয়ার ইতিহাসে এ যাবৎ যত মুক্তিসংগ্রাম ঘটে গেছে, যত বিপ্লব হয়ে গেছে, কিউবার মুক্তিসংগ্রাম তথা কিউবার বিপ্লব চরিত্রের দিক থেকে ও প্রকরণগত ব্যাপারে একেবারে ভিন্ন। এর বিরুদ্ধে যতই এরজাম লাগানো হোক না কেন, লাতিন অ্যামেরিকার মজলুন জনগণের পক্ষে কিউবা এক নতুন স্বরে কথা বলছে। অন্যান্য বিপ্লবের সাথে কিউবার বিপ্লবের যে মৌল প্রভেদ তাকে খুব অল্প কথায় চমৎকার ভাবে দ্যব্রে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"Under certain conditions, the political and the military are not seperate, but form ore organic whole, consisting of the people's army, whose nucleus is the guerrilla army. The vanguard party can exist in the form of the guerrilla foco itself. The guerrilla force is the party in embryo."

এই পর্যন্ত বলবার পরও কিন্তু আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে, রাজনৈতিক আদর্শ ছাড়া কখনো গেরিলা বাহিনী গঠিত হতে পারে না। সামরিক কায়দার সাথে রাজনৈতিক শিক্ষাও প্রতিটি যোদ্ধার কাছে অনস্বীকার্য। A guerrilla force cannot develop on the military level if it does not become a political vanguard. যে পর্যন্ত তারা রাজনৈতিক পথ খুঁজে না পাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিছক বুর্জোয়াদের ওপর চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহৃত হবে, ততদিন পর্যন্ত কোন গেরিলা তৎপরতাই যথার্থ তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে, এটা একটা গণসংগ্রাম, যার সামরিক বিজয় আসলে রাজনৈতিক সাফল্যের সামিল। শোষিত জনগণের মুক্তিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন ভাষাভাষী হরেক রকম লোকের সমাবেশ ঘটে গেরিলাদের পতাকাতলে। কিন্তু তাদের মধ্যকার অনৈক্য দূর করে একই আদর্শের অনির্বান শিখায় প্রজ্জ্বলিত ক'রে তুলতে হবে।

বিস্মিত শ্রদ্ধার সাথে লক্ষণীয়, সিয়েরার গেরিলাদের মধ্যে ফিদেল কাস্ত্রো আশ্চর্য দক্ষতায় সেই আদর্শের সঞ্চার করেছিলেন, যা ক্রমে গোটা জাতি গ্রহণ করেছিল। ১৯৫৭-এর ২১শে জুলাই নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ফিদেল কাস্ত্রো ফ্রাঙ্ক পেইস্‌কে সিয়েরা থেকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাই এখানে তুলে ধরা হলো :

"...The renovating spirit, the longing for collective excellence, the awareness of a higher destiny are in full flower and can develop considerably further. We had heard of these things, which had a flavour of verbal abstraction, and we accepted their beautiful meaning, but now we are living it, we are experiencing it in every sense, and it is truely unique. We have seen its incredible development in this Sierra, which is our small universe. Here the word 'People', which is so often utilised in a vague and confused sense, becomes a living, wonderful, and dazzling reality. 'Now' I know who the people are : I see them in the bands of thirty or forty men, lighting their way with lanterns, who descend the muddy slopes at two or three in the morning, with 30 Kilos on their backs, in order to supply us with food. Who has organised them so wonderfully ? Where did they acquire so much ability, astuteness, courage, self-sacrifice ? No one knows ! It is almost a mystery ! They organise themselves all alone, spontaneously ! When weary animals drop to the ground, unable to go further,

men appear from all directions and carry the goods. Force cannot defeat them. It would be necessary to kill them all, to the last peasant and that is impossible; this the dictatorship cannot do; the people are aware of it and are daily more aware of their growing strength...."

সেই স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের বাণী রেজি দ্যব্রে বিস্মিত পুলকে তাঁর 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' বইতে চিত্রিত করেছেন। কিউবার বিপ্লব যে একটা বিরাট তাৎপর্য নিয়ে এসেছে এবং এতকালের কায়েমী ধারণাকে প্রায় নস্যাৎ করে দিয়েছে, দ্যব্রে তাঁর বইতে সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। নিঃসন্দেহে আকর্ষক তত্ত্ব। দুনিয়ার সংগ্রামী জনতার সামনে এক বিরাট্ প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বেই বিশ্বাসী, তাঁদের কাছেও এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বইটি প্রকাশের সাথে সাথে দারুণ সাড়া পড়ে যায়, দ্রুত কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং লক্ষ লক্ষ কপি বই মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

দ্যব্রে নিঃসন্দেহে একজন পরিণত চিন্তাবিদ্। কিউবার বিপ্লবকে সামনে রেখে তিনি যেন আগামী বিপ্লবের রূপরেখা এঁকেছেন। অন্ততঃ তিনি বিশ্বাস করেন, লাতিন অ্যামেরিকার মুক্তি এই পথেই আসবে। ফিদেলের দর্শনে গভীর আস্থা নিয়ে তাঁরও প্রত্যয়, নতুন সংগ্রাম ধারা কোন তথাকথিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধ্বজা তুলে প্রতিষ্ঠিত নয়; কোন আন্তর্জাতিক বিশেষ ধারাকেও সে অনুসরণ করে না; কোন বিশেষ পরিচিত স্কুলেও তাদের শিক্ষা নিতে হয় নি।

"We don't belong to any sect; we do not belong to an international Masonic order; we don't belong to any church."

কিন্তু তবু আমরা 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব ?' কে এক কথায় বাহবা দিতে পারি না। আমরা স্পষ্টতঃই দেখতে পাচ্ছি, এর মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব জড়াজড়ি ক'রে রয়েছে। সেই জট ছাড়িয়ে আসল বস্তু টেনে বের করলে আমরা এক আবেগপ্রধান বিপ্লবী মানসিকতার স্পর্শ পাই সত্যি, কিন্তু বাস্তবের গ্রানিট পাথরে আছড়ে পড়ে সেই মানসিকতা আত্মরক্ষা করতে পারবে কিনা সন্দেহ!

দ্যব্রে বললেন, আমরা অতীতকে বিদায় দিয়েছি! কিন্তু অতীতকে তিনি কী ভাবে অস্বীকার করতে পারেন? যে সংগ্রাম ইতিহাস থেকে শিক্ষা লাভ করে না, সেই সংগ্রামের বিপর্যয় অনিবার্য। বিপ্লব কখনো মাটি ফুঁড়ে ওঠে না, এর পিছনে থাকে দীর্ঘ—দীর্ঘ যুগের প্রস্তুতি। ফিদেলের নেতৃত্বে যে গণবাহিনী সংগঠিত হয়েছিল, তারা কিসের ফলশ্রুতি। নিছক ফিদেলের বিরল নেতৃত্ব? না, তা হতে পারে না। ফিদেল তাঁর পায়ের নীচে জমি পেয়েছিলেন, কিউবার পূর্বসূরী বিপ্লবীদের পুঞ্জ পুঞ্জ সংগ্রামের ফলেই। শহরে যাঁরা আন্দোলন গড়ে তোলেন, তাঁদের নেপথ্য ভূমিকা কি কম? দ্যব্রের ভাষায় তাঁরা 'বুর্জোয়া' হতে পারেন, কিন্তু এই 'বুর্জোয়া-সংগ্রামই' বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ওপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করেছিল ; যে চাপের সুযোগ নিয়ে সিয়েরার বনাঞ্চলে ফিদেল কাস্ত্রো, রাউল ও চে গুয়েভারা গেরিলাদের শক্তিকে সংহত করতে পেরেছিলেন। দ্যব্রের ব্যাখ্যানুযায়ী শহরে যারা ধর্মঘট ইত্যাদি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন, তাঁরা নাকি একজন গেরিলার তুলনায় অনেক বেশী বুর্জোয়া। এ ব্যাখ্যা ধোপে টেকে না। মার্কস-এঙ্গেলস কি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক-মজুরদের এই ধরণের সংগ্রামকে স্বাগত জানান নি? আর ব্যর্থতা? ও শব্দটা এখানে একেবারে আপেক্ষিক। কোন সংগ্রামই ব্যর্থ নয়। বরং, প্রতিটি তথাকথিত ব্যর্থ সংগ্রামই আগামী বৃহৎ সার্থক সংগ্রামের পথকে সুগম করে। কিউবার রাজনৈতিক দলগুলি এখানকার প্রধান প্রধান শহরে যে দীর্ঘ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিল,

বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তিকে তা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। সেই ধর্মঘটের ফলে শহর ও নগর জেগে উঠেছিল বলেই সিয়েরার গেরিলারা গণ-জীবন থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিল। স্বয়ং কাস্ত্রো কী রাষ্ট্র-যন্ত্রকে অচল ক'রে দেবার সেই প্রয়াসকে সমর্থন করেন নি? দ্যব্রে কেন এগুলিকে অস্বীকার করছেন?

দ্যব্রের আর একটি আশ্চর্য তত্ত্ব, পার্টি গঠনের আগেই গণমুক্তি বাহিনী গড়ে উঠবে! এটা কি বাস্তব? গণমুক্তি বাহিনী তো গঠিত হবে দূর দূর গ্রামাঞ্চলে কিংবা, দুর্গম বনাঞ্চলে ও পাহাড়ী উপত্যকায়! কিন্তু যে আদর্শের জোরে সেই বাহিনী গড়ে উঠবে, সেই আদর্শকে তামাম মেহনতী জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেবে কারা? কি সেই মাধ্যম? শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক দলগুলিই কী সেই ভূমিকা পালন করবে না? ইতিহাস তো বলে, প্রতিটি সংগ্রামের কতকগুলি স্তর থাকে। সেই স্তরগুলি এক লাফে পেরিয়ে যাবার অপচেষ্টা না করাই বাঞ্ছনীয়! শ্রেণী-সংগ্রাম ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় কোন দলের নেতৃত্বেই এবং সেই দলই চূড়ান্ত সংগ্রামের [রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করবার জন্য] গণবাহিনী গড়ে তুলবে। সোভিয়েত রাশিয়ায়, চীনে বা ভিয়েতনামে এই পথেই সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছিল।

দ্যব্রের দৃঢ় প্রত্যয়, কিউবার পথেই লাতিন অ্যামেরিকার প্রতিটি দেশে বিপ্লবের অভিষেক হবে। আমরা কিন্তু এটাও নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারছি না। রাজনৈতিক দলগুলি যদি জনতার মধ্যে সেই আদর্শের বীজ বপন না করতে পারে, গেরিলারা সেখানে কোনদিন শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারবে না। দু'শ' বা চারশ' গেরিলা গোটা জাতির মুক্তি নিয়ে আসবে? আকাশ কুসুম কল্পনা। আরো পার্টি গঠিত হোক, আদর্শ প্রচারিত হোক, তারপর শুরু হবে সশস্ত্র সংগ্রাম। দ্যব্রের তত্ত্বই যদি যথার্থ হতো; তবে বলিভিয়ার জঙ্গলে চে গুয়েভারার মতো গেরিলা সেনানীকে আমরা হারাতাম না।

যেখানে জনতার মধ্যে বিপ্লবের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ভাবে দানা বাধেনি, একদল গেরিলা সেখানে কী ভাবে বেয়নেটের মুখে বিপ্লবকে চাপিয়ে দিতে পারে? সেই মুষ্টিমেয় মুক্তিযোদ্ধার ত্যাগ, আদর্শ ও সাহসিকতাকে আমরা সশ্রদ্ধে স্মরণ করছি। কিন্তু সাথে সাথে আমরা শিক্ষা গ্রহণও করছি। কারণ, ইতিহাস থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। হওয়া সম্ভবও নয়। সংগ্রামের কোন স্তরকেই উপেক্ষা না করে অমেয় প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছি সেই মুহূর্তগুলির জন্য, যখন গোটা মেহনতী জনতা রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে গণযুদ্ধের সামিল হবে এবং যখন তারই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বিপ্লবের রক্তরাঙা পতাকা উড্ডীন হবে বুর্জোয়াদের নাগপাশকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে!

॥ শেষ ॥

(i) "Regis Debray has been arrested by the Bolivian authorities, not for having participated in guerrilla activities, but for having written a book—'Revolution dens la revolution ?"

—Jean-Paul Santre,

(ii) " We don't belong to any sect : We don't belong to an international Masonic order : we don't belong to any church."

—Fidel Castro.

(iii) "The Principal stress must be laid on the development of guerrilla warfare and not on the strengthening of existing parties or the creation of new parties."

—Regis Debray.

(iv) "With no other alternative hut death or victory, at moments when death was a 'concept a thousand times more real, and victory a mayth that only a revolutionary can dream of."

—Che.

(v) "The only path to liberation is that of armed mass struggle."

—Ho chi Minh.

(v) "Our Party came into being when the Vietnamese revolutionary movement was at its peak. From the beginning it led the peasants, encouraged them to rise up Soviet power. Thus, at an early stage, it became aware of the problems of revolutionary power and of armed struggle"—Giap.

(vii) "Who will make the revolution in Latin America ? Who ? The people, the revolutionaries, with or without a party"—Fidel.

(viii) "Politics directs the gun"—Mao Tse-Tung.

(ix) "The Cuban Revolution can no longir be repeated in Latin America."—

A running proverb in the
United States of America.